আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আত তথা
মাসলাকে আলা হযরত-এর মুখপাত্র

মাসিক পত্রিকা

আল-মিসবাহ

April-2024

প্রকাশনায়

সুন্নী ইসলামিক মিশন

হেড অফিস-

আল-জামিয়াতুল আশরাফিয়া

(মুবারকপুর, আজমগঢ়, উত্তর প্রদেশ)

পরিচালনায়:-WB MISBAHI NETWORK

স্মরণার্থে

জালালাতুল ইলম, হুযূর হাফিযে মিল্লাত রহমতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ

উপদেষ্টা পরিষদ

মুহাক্কিকে মাসায়েলে জাদীদাহ হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ নেযামুদ্দীন রেজবী বারকাতী মিসবাহী
(শাইখুল হাদীস ও ইফতা বিভাগের প্রধান আল জামেয়াতুল আশরাফিয়া, মোবারকপুর, ইউ.পি.)

আদীবে শাহীর আল্লামা মুফতী শাহযাদ আলম মিসবাহী রেজভী
(শাইখুল আদব জামিয়াতুর রেযা, বেরেলী শরীফ, ইউ.পি.)

হযরত আল্লামা মুফতী আব্দুল খালিক্ব সাহেব
(প্রধান শিক্ষক জামে আশরাফ কিছৌছা শরীফ, ইউ.পি.)

হযরত আল্লামা মুফতী অয়েযুল হক হাবীবী মিসবাহী
শাইখুল হাদীস মাদ্রাসা জামিয়া রাযাভিয়্যা, পঞ্চানন্দপুর, মোথাবাড়ী, মালদা

হযরত আল্লামা শাহজাহান আলম আযীযী
শাইখুল হাদীস চান্দপুর মাদ্রাসা, কালিয়াচক, মালদা।

মুফতী মকবুল আহমদ মিসবাহী দঃ২৪পরগনা

হযরত আল্লামা মুফতী যুবায়ের আলম রেজভী সাহেব মুর্শিদাবাদ ।

হযরত আল্লামা মুফতী আলিমুদ্দিন রেজভী সাহেব মুর্শিদাবাদ ।

আল্লামা ডাঃ সাজ্জাদ আলম মিসবাহী

আল্লামা ডাঃ সাদরুল ইসলাম মিসবাহী

আল্লামা আব্দুর রহীম মিসবাহী, মালদা

মুফতী ফজলুল রহমান মিসবাহী

মুফতী আমজাদ হুসাইন সিমনানী, দঃ দিনাজপুর

মুফতী আব্দুল আজীজ কালিমী, মালদা

মুফতী লতফুর রহমান মিসবাহী আজহারী, মালদা

মুফতী শাহজাহান, বীরভূম

মুফতী আলী হুসাইন তাহসীনী

ফাতওয়া বিভাগের মুফতীয়ানে কেরাম

হযরত আল্লামা মুফতী অয়েযুল হক হাবীবী মিসবাহী
শাইখুল হাদীস মাদ্রাসা জামিয়া রাযাভিয়্যা,
পঞ্চানন্দপুর, মোথাবাড়ী, মালদা

মুফতী রফীক আলম মিসবাহী, মালদা
সিনিয়র শিক্ষক মাদ্রাসা জামিয়া রাযাভিয়্যা,
পঞ্চানন্দপুর, মোথাবাড়ী, মালদা

মুফতী মঈন উদ্দীন মিসবাহী, মুর্শিদাবাদ
হেড শিক্ষক সুলতানপুর ও মালীপুর সুন্নী মাদ্রাসা

মুফতী আলামীন মিসবাহী, পাকুড়
সিনিয়র শিক্ষক সুলতানপুর ও মালীপুর সুন্নী মাদ্রাসা

মুফতী আবূ বকর মিসবাহী, বীরভূম
শাইখুল হাদীস মেটিয়াব্রুজ, কোলকাতা

মুফতী গুলজার আলী মিসবাহী, উঃ দিনাজপুর
সিনিয়র শিক্ষক খালতিপুর মাদ্রাসা, কালিয়াচক, মালদা।

সদস্য মন্ডলী

মুফতী রাফিক আলম মিসবাহী	মুফতী জয়নুল আবেদীন মিসবাহী
মুফতী শামসুদ্দীন মিসবাহী	ক্বারী সৈয়দ মাজহারুল হক্ব মিসবাহী
মুফতী মুক্বসিদ মিসবাহী	মাওলানা আলী রেযা মিসবাহী
মুফতী আফতাব আলম মিসবাহী	মাওলানা আব্দুল মাবুদ মিসবাহী
মুফতী মঈনুদ্দিন মিসবাহী	মাওলানা আকবর আলী মিসবাহী
মুফতী উমর ফারুক মিসবাহী	মাওলানা গোলাম গৌস মিসবাহী
মুফতী সুলতান আলী মিসবাহী	মাওলানা আব্দুল কাবির সাহেব
মুফতী সাহীমুদ্দীন মিসবাহী আজহারী	মাওলানা মুস্তাক্বীম রাজা মিসবাহী
মুফতী হাশিমুদ্দিন মিসবাহী	মাওলানা দাতা মাহবুব মিসবাহী
মুফতী আতাউর রহমান মিসবাহী	মাওলানা ইনজেমা-মুল হক্ব মিসবাহী
মুফতী গুলাপ হুসাইন মিসবাহী	মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক মিসবাহী
মুফতী আলামিন মিসবাহী	মুফতী নুরুল ইসলাম
মুফতী মুঈজুদ্দিন মিসবাহী	মাওলানা শামীম আখতার মিসবাহী
মুফতী জাহাঙ্গীর আলম মিসবাহী	মাওলানা আশিকুর রহমান মিসবাহী
মুফতী আসমাউল হক্ব মিসবাহী	মাওলানা সুলাইমান মিসবাহী
মুফতী বিলাল হুসাইন মিসবাহী	সৈয়দ সামিরুল ইসলাম চিশতী
মুফতী আবু বকর মিসবাহী	মুফতী মেহেরবান আলী
মুফতী গুলজার আলী মিসবাহী	সৈয়দ গোলাম মুসতারশিদ আল-ক্বাদরী
মাওলানা মোমিন আলী মিসবাহী	মুফতী শামসুদ্দোহা মিসবাহী
মুফতী গোলাম মুস্তাফা মিসবাহী	মাওলানা আবুল কালাম আযাদ মারকাযী
মুফতী আনজারুল ইসলাম মিসবাহী	ক্বারী সাজিদুল ইসলাম মিসবাহী
মুফতী মারজান মিসবাহী	মুফতী মুসলিম আলী
মুফতী মুতিউর রহমান মিসবাহী	ক্বারী স্বয়নুল ইসলাম মিসবাহী
মুফতী গোলাম মাসরুর আহমাদ মিসবাহী	জনাব শাহিদুল ইসলাম সাহেব
মুফতী তৌহীদুর রহমান আলাঈ জামেঈ	হাফিজ মেহেদী হাসান সাহেব
মাওলানা দাউদ আলম মিসবাহী	মাওলানা নাসির শেখ মিসবাহী
ক্বারী সাজিমুদ্দিন মিসবাহী	মাওলানা হিশামুদ্দিন মিসবাহী
হাফিয মুস্তাকিম	মাওলানা হাশিমুদ্দিন মিসবাহী
মাওলানা গুলাম মুস্তফা	মাওলানা মাসউদুর রহমান
মুফতী জাহাঙ্গীর আলম রেজবী, ঝাড়খন্ড	মুফতী আবুল কালাম আজাদ, মুর্শিদাবাদ
মুফতী আবরার আলম মিসবাহী	মুফতী সাবির মিসবাহী
ক্বারী আমির সোহেল মিসবাহী	ক্বারী মুনিরুদ্দিন মিসবাহী
হাফিয তারিক রেজা	মাওলানা রৌশন আলী আলাঈ

সূচীপত্র

বিষয় ও লেখক | পৃষ্ঠা নং

1	নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈন কত রাক'আত তারাবীহ পড়তেন? মুফতী আমজাদ হুসাইন সিমনানী	2
2	টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় করার বিধান মুফতী আব্দুল আজীজ কালিমী	6
3	আ'লা হযরত বিদ'আতের বিনাশকারী ছিলেন মুফতী গুলজার আলী মিসবাহী	8
4	মৌখিক নিয়ত করার বিধান মুফতী রফিক আলম বারকাতী মিসবাহী	12
5	রোজার উদ্দেশ্য ও তা থেকে অবহেলার ফলাফল মুফতী মুহাম্মদ রফিকুল খাঁন	14
6	লাইলাতুল ক্বদরের ফাজিলত মুফতী উমর ফারুক মিসবাহী	16
7	যাকাতের বিবরণ মাওলানা মুহাম্মদ মঈনুদ্দিন মিসবাহী	20
8	রমজান মাসে ওমরাহ পালনের ফজিলত মুফতী আলামীন মিসবাহী	22
9	১৭ ই রমাদ্বান ইসলামী ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন মুফতী শামসুদ্দোহা মিসবাহী	24
10	ঈদের নামাজের জন্য মহিলাদের ঈদগাহে যাওয়া নিষিদ্ধ কেন? মুফতী আসগর আলী আলাঈ	26
11	রোজা ভঙ্গের কারণ সমূহ মাওলানা আশিকুর রহমান মিসবাহী	28
12	রমজান মাসের গুরুত্ব ও মর্যাদা মাওলানা হিশামুদ্দিন মিসবাহী	29
13	রোজা সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল মাওলানা হাশিমুদ্দিন মিসবাহী	31

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈন কত রাক'আত তারাবীহ পড়তেন?

মুফতী আমজাদ হুসাইন সিমনানী সাহেব,
কুশমান্ডি,দঃ দিনাজপুর

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুড়ি রাক'আত তারাবীহ আদায় করতেন-

عن ابن عباش، أن النبى ﷺ كان يصلى فى رمضان عشرين ركعة سوى الوتر

অর্থাৎ:-হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে বিতর ব্যতীত কুড়ি রাক'আত তারাবীহ নামাজ আদায় করতেন।

{{মু'জামে আওসাত তাবরানী খন্ড-১ পৃষ্ঠা-২৪৩ হাদিস নং-৭৯৮,, মুনতাখাব মিন মুসনাদ আবদ ইনবে হামীদ খন্ড-১ পৃষ্ঠা-২১৮ হাদিস নং-৬৫৩, মিরকাত খন্ড-৩ পৃষ্ঠা-৯৭৩ }}

হযরত আলী, অন্যান্য সাহাবা ও তাবেয়ীন রাদিয়াল্লাহু আনহুম কুড়ি রাক্আত তারাবীহপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

*হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কুড়ি রাক'আত তারাবীহপ্রতিষ্ঠা করেছেন

عن ابن أبيى الحسناء، أن عليا أمر رجلا يصلى بهم فى رمضان عشرين ركعة

অর্থাৎ:-ইবনে আবি হাসানায়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নিশ্চয়ই আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক ব্যক্তি কে লোকজনদের নিয়ে রমযান মাসে কুড়ি রাক'আত তারাবীহ আদায় করার নির্দেশ দিলেন।

{{মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১৬৩ হাদিস নং-৭৬৮১,, আল-ইযতিযকার খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৭০,, মুখতাসার ইখতেলাফুল উলামা খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৩১২,, উমদাতুল কারী খন্ড-১১ পৃষ্ঠা-১২৭,, আল-ইবানাতুল কুবরা খন্ড-৮ পৃষ্ঠা-৩৯৭,, তারগীব লি-কেওয়াম খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৩৬৮ হাদিস নং-১৭৮৯,, আশ-শারিয়াহ লি-আজুরী খন্ড-৪ পৃষ্ঠা-১৭৮১ }}

عن أبى الحسناء، أن عليا رضى الله عنه قال دعا القراء فى رمضان فأمر منهم رجلا يصلى بالناس عشرين ركعة

অর্থাৎ:-হযরত আবুল হাসানা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু জনৈক ব্যক্তি কে লোকজনদের নিয়ে রমযান মাসে পাঁচ তারবীহার সহিত বিশ রাক'আত তারাবীহ আদায় করার নির্দেশ দেন।

{{আশ-শারীয়াহ লিল আজুরী খন্ড-৪ পৃষ্ঠা-১৭৮১ হাদিস নং-১২৪০,, আল-ইবানাতুল কুবরা খন্ড-৮ পৃষ্ঠা-৩৯৮,, সুনানে কুবরা বাইহাকী হাদিস নং-৪২৯২}}

عن أبى عبد الرحمن السلمى، عن على رضى الله عنه قال دعا القراء فى رمضان فأمر منهم رجلا يصلى بالناس عشرين ركعة

অর্থাৎ:-আবু আব্দুর রাহমান সালামী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু রমযান মাসে ক্বারীদের ডেকে তাদের মধ্য হতে একজন ব্যক্তি কে লোকজনদের নিয়ে কুড়ি রাক'আত তারাবীহ আদায় করার নির্দেশ দেন।

{{সুনানে কুবরা বাইহাকী খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৬৯৯ হাদিস নং-৪২৯১ }}

***ইমাম তিরমিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মতানুযায়ী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে ২০ রাকাত তারাবীহ সঠিক ও গ্রহনযোগ্য সুত্রে প্রমাণিত।**

***অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈন রাদিয়াল্লাহু আনহুম কুড়ি রাক'আত তারাবীহ প্রতিষ্ঠা করেছেন**

عن السائب بن يزيد أنهم كانوا يقومون فى رمضان بعشرين ركعة

অর্থাৎ:-সাঈব বিন ইয়াজিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তাঁরা রমযান মাসে কুড়ি রাক'আত তারাবীহ আদায় করতেন।

{{মুখতাসার ইখতেলাফুল উলামা খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৩১২}}

عن زبن بن وهب قال كان عندالله بن مسعود يصلى لنافى شهر رمضان فينصرف وعليه ليل قال الأعمش كان يصلى عشرين ركعة ويوتر بثلاث

অর্থাৎ:-হযরত যায়েদ বিন ওহাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রমযান মাসে আমাদের তারাবীহ পড়াতেন। তিনি রাতের কিছু অংশ থাকতে তারাবীহ সমাপ্ত করতেন। হযরত আ'মাশ বলেন, তিনি কুড়ি রাক'আত তারাবীহ ও তিন রাক'আত বিতর আদায় করতেন।

{{উমদাতুল কারী খন্ড-১১ পৃষ্ঠা-১২৭,, মাজমাউয যাওয়ায়িদ খন্ড-৩ পৃষ্ঠা-১৩২ হাদিস নং-৫০১৯}}

***ইমাম হাইসামী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন-**

رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح

অর্থাৎ:-হাদীসটি ইমাম তাবরানী "মু'জামে কাবীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যার বর্ণনাকারীগণ বিশস্ত ও সহীহ।

كان سعيد بن جبير يصلي بنافي رمضان أربعة وعشرين ركعة، وكان يوتر بثلاث

অর্থাৎ:-হযরত সাঈদ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাদের রমযান মাসে চব্বিশ রাক'আত (চার রাক'আত ইশার ফরয ও বিশ রাক'আত তারাবীহ) নামাজ পড়াতেন এবং তিন রাক'তের সহিত বিতর আদায় করতেন।

{{মুসনাদুশ শামিয়ীন খন্ড-৩ পৃষ্ঠা-২৮৪}}

عن عبد الله بن قيس، عن شتير بن شكل، أنه كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر

অর্থাৎ:-হযরত শুতাইর বিন শাকল্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নিশ্চয়ই তিনি রমযান মাসে কুড়ি রাক'আত তারাবীহ অতঃপর বিতর নামাজ আদায় করতেন।

{{মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১৬৩ হাদিস নং-৭৬৮০,, ফাযাইলি আওকাত বাইহাকী খন্ড-১ পৃষ্ঠা-২৭৬}}

حدثنا وكيع، عن نافع بن عمر، قال كان ابن أبي مليكة يصلي بنافي رمضان عشرين ركعة

অর্থাৎ:-হযরত নাফেয় বিণ উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনে আবী মুলাইকা রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাদেরকে রমযান মাসে কুড়ি রাক'আত তারাবীহ পড়াতেন।

{{ মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১৬৩ হাদিস নং-৭৬৮৩,, তারগীব লি-কেওয়াম খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৩৬৮ হাদিস নং-১৭৯১ }}

***ইমাম নিমাভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,**

واسناده صحيح

অর্থাৎ:-হাদিসটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

{{আসারুস সুনান}}

عن عبد العزيز بن رفيع قال كان أبي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث

অর্থাৎ:-হযরত আব্দুল আজিজ বিন রাফীয় রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু রমযান মাসে মদীনা শরীফে লোকজনদেরকে কুড়ি রাক'আত তারাবীহ ও তিন রাক'আত বিতর নামাজ পড়াতেন।

{{মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১৬৩ হাদিস নং-৭৬৮৪}}

***ইমাম নিমাভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-**

اسناده مرسل قوي

অর্থাৎ:-হাদিসটি সহীহ মুরসাল সনদে বর্ণিত হয়েছে।

{{আসারুস সুনান }}

عن أبي اسحاق، عن الحارث، أنه كان يؤم الناس في رمضان بالليل بعشرين ركعة، ويوتر بثلاث، ويقنت قبل الركوع

অর্থাৎ:-হযরত আবু ইসহাক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। হযরত হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকজনদের রমযান মাসের রাত্রিতে ইমামতি করতেন কুড়ি রাক'আত তারাবীহ ও তিন রাক'আত বিতর নামাজের সহিত এবং তিনি রুকুর পূর্বে কুনূত পাঠ করতেন।

{{মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১৬৩ হাদিস নং-৭৬৮৫}}

عن أبي البختري أنه كان يصلي خمس ترويحات في رمضان، ويوتر بثلاث

অর্থাৎ:-হযরত আবুল বুখতারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নিশ্চয়ই তিনি রমযান মাসে পাঁচ তারবীহার (চার রাক'আতে এক তারবীহা গণ্য হয়) সহিত তারাবীহ নামাজ আদায় করতেন এবং তিন রাক'আত বিতর নামাজ আদায় করতেন।

{{ মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১৬৩ হাদিস নং-৭৬৮৬ }}

عن عطاء بن أبي رباح، قال كانوا يصلون في شهر رمضان عشرين ركعة، والوتر ثلاثا

অর্থাৎ:-হযরত আতা বিন আবু রাবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারা রমযান মাসে কুড়ি রাক'আত তারাবীহ ও তিন রাক'আত বিতর নামাজ আদায় করতেন।

{{ফাযাইলে রামজান লি-ইবনে আবী দুনিয়া খন্ড ১ পৃষ্ঠা ৭৯ হাদিস নং-৪৯ }}

عن عطاء، قال أدركت الناس وهوم يصلون ثلاث وعشرين ركعة بالوتر

অর্থাৎ:-হযরত আতায়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি লোকজনদেরকে বিতরের নামাজ সহ তেইশ রাক'আত নামাজ আদায় করতে পেয়েছি।

{{মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১৬৩ হাদিস নং-৭৬৮৮,, আল-ইযতিযকার খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৭০,, শারহে সাহীহিল বুখারী ইবনে বাত্তাল খন্ড-৩ পৃষ্ঠা-১৪১}}

*ইমাম নিমাভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত হাদিস সম্পর্কে বলেন, اسناده حسن হাদিসটি হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে।

{{আসারুস সুনান}}

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! হযরত আত্বা ইবনে আবী রাবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হলেন, সর্বসম্মতিক্রমে বিশ্বস্ড় ও প্রসিদ্ধ তাবেয়ী। তিনি নিজ জীবনে অসংখ্য সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম ও বিখ্যাত ইমাম ও মুজতাহিদ তাবেঈন গণের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। তাঁর কথা মতে সেই সময়ের সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ ইমাম ও মুজতাহিদ তাবেঈনে এজাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম কুড়ি রাক'আত তারাবীহ আদায় করতেন। যা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এজামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ও আমল অনুযায়ী তারাবীহের রাক'আত সংখ্যা হল কুড়ি।

عن سعيد بن عبيدأن علي بن ربيعة كان يصلي بهم في رمضان خمس ترويحات، ويوتر بثلاث

অর্থাৎ:-হযরত সাঈদ বিন ওবায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী বিন রাবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকজনদেরকে পাঁচ তারবীহার সহিত (কুড়ি রাক'আত) তারাবীহ ও তিন রাক'আত বিতর নামাজ পড়াতেন।

{{মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১৬৩ হাদিস নং-৭৬৯০ }}

*ইমাম নিমাভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- اسناده صحيح

অর্থাৎ:-হাদিসটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

{{আসারুস সুনান}}

أبوالخصيب قال كان يؤمنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي خمس ترويحات عشرين ركعة

অর্থাৎ:-হযরত আবু খুসাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত সয়াঈদ বিন গাফলাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু রমযান মাসে আমাদের ইমামতি করতেন। তিনি পাঁচ তারবীহার সহিত কুড়ি রাক'আত তারাবীহ আদায় করতেন।

{{সুনানে কুবরা বাইহাকী খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৬৯৯ হাদিস নং-৪২৯০,, ফাযাইলি আওকাত বাইহাকী খন্ড-১ পৃষ্ঠা-২৭৬}}

*ইমাম নিমাভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

واسناده حسن

অর্থাৎ:-হাদিসটি হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে।

{{আসারুস সুনান}}

أبوالخصيب قال يحيى بن موسى قال نا جعفر بن عون سمع أبا الخصيب الجعفي كان سويد بن غفلة يؤمنا في رمضان عشرين ركعة

অর্থাৎ:-হযরত আবু খুযাইব জা'ফী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। হযরত সুয়াঈদ বিন গাফলাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু রমযান মাসে আমাদের কুড়ি রাক'আত তারাবীহের ইমামতি করতেন।

{{আত-তারীখুল কাবীর খন্ড-৯ পৃষ্ঠা-২৮ }}

*ইমাম নিমাভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

واسناده حسن

অর্থাৎ:-হাদিসটি হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে।

{{আসারুস সুনান}}

وروينا عن شتير بن شكل، وكان من أصحاب علي رضي الله عنه أنه كان يؤمهم في شهر رمضان بعشرين ركعة، ويوتر بثلاث وفي ذلك قوة لما

অর্থাৎ:-হযরত শুতাইর বিন শাকল্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত এবং তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গীদের মধ্য হতে ছিলেন। তিনি লোকজনদের রমযান শরীফে কুড়ি রাক'আত তারাবীহ ও তিন রাক'আত বিতরের ইমামতি করতেন।

{{সুনানে কুবরা বাইহাকী খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৬৯৯ হাদিস নং-৪২৯০,, ফাযাইলি আওকাত বাইহাকী খন্ড-১ পৃষ্ঠা-২৭৬}}

عن عبد العزيز بن رفيع قال كان أبي بن كعب رضي الله عنه يصلي بالناس في رمضان عشرين ركعة

অর্থাৎ:-হযরত আব্দুল আজিজ বিন রাফী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকজনদের রমযান মাসে কুড়ি রাক'আত তারাবীহ পড়াতেন।

{{তারগীব লি-কেওয়াম খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৩৬৮ হাদিস নং-১৭৯০}}

*বুখারী শরীফের প্রখ্যাত ভাষ্যকার হযরত ইমাম বাদরুদ্দীন আইনি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

وأما القائلون من التابعين فشتير بن شكل وابن أبي مليكة والحارث الهمداني وعطاء بن أبي رباح، وأبو بختري وسعيد بن أبي الحسن البصري وعبدالرحمن ابن أبي بكر وعمران العبدي

অর্থাৎ:-তাবেঈন গণের মধ্য হতে যে সমস্ত ব্যক্তি হতে কুড়ি রাক'আত তারাবীহ বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-হযরত শুতাইর বিন শাকল্, হযরত ইবনু আবী মুলাইকা, হযরত হারিস হামদানী, হযরত আতা ইবনে আবি

রাবাহ, হযরত আবু বাখতারী, হযরত সাঈদ বিন আবুল হাসান বাসরী, হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বাকার ও হযরত ইমরান আবাদী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম।

{{উমদাতুল কারী খন্ড-১১ পৃষ্ঠা-১২৭}}

উল্লেখ্য যে, বোখারী শরীফের প্রখ্যাত ভাষ্যকার আল্লামা ইমাম বাদরুদ্দীন আইনি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এর মন্তব্য থেকে এটা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার যে, উল্লেখিত তাবেঈন হতে গ্রহণযোগ্য সূত্রে কুড়ি রাক'আত তারাবীহ প্রতীয়মান হয়েছে। নচেত তিনি হাদীস শাস্ত্রের মহা পন্ডিত হওয়ার পরেও তাদের নাম কোন ভাবেই উল্লেখ করতেন না।

*ঈমান বাদরুদ্দিন আইনি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ন্যায় ইমাম হাফিজ ইবনু আব্দিল বার (ইন্তেকাল ৪৬৩-হিঃ) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-ও বলেন,

وروى عشرون ركعة عن علي وشتير بن شكل وابن أبي مليكة والحارث الهمداني وأبي البختري

অর্থাৎ:-কুড়ি রাক'আত তারাবীহ সংক্রান্ত হাদিস বর্ণিত হয়েছে-হযরত আলী, হযরত শুতাইর বিন শাকল্, হযরত ইবনু আবী মুলাইকা, হযরত হারিস হামদানী ও হযরত আবুল বাখতারী রাদিয়াল্লাহু আনহুম হতে।

{{আল-ইসতিজকার খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৬৯}}

সম্মানিত সুধী! এতক্ষণে আপনারা অবশ্যই অবগত হয়েছেন যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় সাহাবা ও তাবেঈন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম ২০ রাক্আত তারাবীহ প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু বর্তমান তথাকথিত আহলে হাদিসদের শায়েখরা বলেন, ২০ রাক্আত তারাবী সুন্নাহ সম্মত ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। আল্লাহ তাআলা এ সমস্ত বিভ্রান্তকারী ও তথাকথিত আহলে হাদীস হতে আমাদের বিরত থাকার তৌফিক দান করুন এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর মত ও পথ অনুসরণ করে জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুন!

وماتوفيقي الا بالله العلي العظيم

আস-সুন্নাহ প্রকাশনী

বাংলা, ইংলিশ, উর্দু ও আরবী ভাষায়
বই অথবা ম্যাগজিন
কম্পোজ করার জন্য
যোগাযোগ করুন।

মাওলানা-রৌশন আলী আশরাফী
9733301647
www.keyofislam.com

আ'লা হাযরাত-এর দশটি সু-পরামর্শ

বর্তমান যুগে আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের ব্যাপক, বহুমুখী ও স্থায়ী উন্নয়নের জন্য, আ'লা হাযরাত রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দেওয়া ১০টি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা মূলক কর্ম সূচী বাস্তবায়ন করা বিশেষ প্রয়োজন।

(আ'লা হাযরাতের নাম দিয়ে কনফারেন্স,জালসা সভা-সমিতি আর মাসলাকে "আ'লা হাযরাতে'র" না'রা লাগিয়েই ক্ষান্ত হলে হবে না, বরং বাস্তবে কিছু কাজ করা চাই কাজ)

(১) বড় বড় মাদ্রাসাহ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং তাতে উপযুক্ত পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করতে হবে।
(২) মাদ্রাসাহর মেধাবী ছাত্রদেরকে প্রয়োজনে আর্থিক অনুদান দিয়ে, তাদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।
(৩) মাদ্রাসাহর সফল ও কর্মী শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন দেওয়ার সু-ব্যবস্থা করতে হবে।
(৪) মেধাবী শিক্ষার্থীরা, যে যে বিষয়ে পারদর্শী হবে, তাকে আর্থিক অনুদান দিয়ে, সে সে বিষয়ে কাজে লাগিয়ে দিতে হবে।
(৫) মেধাবী শিক্ষার্থীরা কাজের উপযুক্ত হয়ে গেলে, তাদেরকে উপযুক্ত বেতন দিয়ে,আহলে সুন্নাত ওয়া জামাআতের বহুমুখী খিদমত করার জন্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠিয়ে দিতে হবে।
(৬) আহলে সুন্নাত ওয়া জামাআতের পক্ষে এবং বদ আক্বীদাহ / বদ মাযহাবদের খন্ডনে যোগ্য লেখকদেরকে সাম্মানিক সালামী দিয়ে, উপকারী ও প্রয়োজনীয় বই পুস্তক লিখাতে হবে।
(৭) লিখিত পুস্তকাদি এবং নতুন বই-পত্র সুন্দও করে ছাপিয়ে দেশের কোনায় কোনায় ফ্রি বিতরণ করার বন্দোবস্ত করতে হবে।
(৮) দেশের যেখানে যে ধরণের বক্তা, মুনাযির, কিতাবাদি ও পত্র-পত্রিকার প্রয়োজন, খবর পেলে, সেখানে তা সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে হবে।
(৯) আমাদের মাঝে যারা ভাল ধর্মীয় কর্মী, অথচ সাংসারিক, তাদেরকে সংসার চালানোর জন্য, বেতন দিয়ে, যে ব্যক্তি যে কাজে পটু, তাকে দিয়ে সেই কাজ করিয়ে নিতে হবে।
(১০) ধর্মীয় যে কোন প্রয়োজনীয় উপযুক্ত লিখনী সম্বলিত দৈনিক অথবা কম পক্ষে সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে স্বল্প মূল্যে অথবা বিনা মূল্যে সারা দেশে পৌঁছে দিতে হবে।

(ফাতাওয়া রাযাবীয়াহ:-২৯/৬০০, ৬০১)

বিঃ দ্রঃ- মাসলাকে আ'লা হাযরাত, শ্লোগান দেওয়া খুব সহজ, কিন্তু আ'লা হাযরাতের কর্ম সূচী বাস্তবায়িত করা অত সহজ নয় মিঞা।

টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় করার বিধান

মুফতী আব্দুল আজিজ কালিমী মানিকচক সিনিয়র শিক্ষকঃ এম.জি.এফ. মদীনাতুল উলুম খালতিপুর, কালিয়াচক, মালদা ।

প্রশ্নঃ মূল্য (টাকা) দিয়ে ফিতরা আদায় করলে কি আদায় হবে নাকি খাদ্যদ্রব্যই দিতে হবে?

উত্তরঃ এটা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, খাদ্যের পরিবর্তে মূল্য (টাকা)আদায় করা সাদকায়ে ফিতর ব্যাপারে ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইমাম ইসহাক বিন রাহাবীয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহিম)বলেন যে, খাদ্যের পরিবর্তে তার মূল্য (টাকা) দিয়ে সাদকায়ে ফিতর আদায় করা জায়েয নয়। ইনারা হাদীসের বাহ্যিক শব্দের দিকে লক্ষ্য রেখে এই মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর, কিসমিস, গম, জব ও মুনাক্কা ইত্যাদি এই জিনিসগুলোকে সাদকায়ে ফিতর হিসেবে হাদীসে উল্লেখ করেছেন। তাই এই আইটেম সমূহের মাধ্যমেই সাদকায়ে ফিতর দিতে হবে। এগুলোর মূল্য পরিশোধ করলে সাদকায়ে ফিতর আদায় হবে না। যদিও ইমাম আবু হানীফা এবং সুফিয়ান সাওরী এবং ইমাম বুখারী, (রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম) বলেন যে, এসব খাদ্য দ্রব্যের পরিবর্তে তার মূল্য দ্বারা সাদাকায়ে ফিতর প্রদান করা জায়েয।

হানাফীদের দলীল সমূহ:

১. দলীল:

হানাফীগন বলেন যে, সাদকায়ে ফিতরের মূল উদ্দেশ্য হ'ল ঈদুল ফিতরের দিন ফকিরদের সুবিধা করে দেওয়া এবং কারও সামনে হাত প্রসারিত করা থেকে মুক্তি দেওয়া। যেমন-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

أَغْنُوهُمْ عَنْ الْمَسْأَلَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ

অর্থাৎ:-দিনে (ঈদের দিনে) গরিব মিসকিনদের-কে কারো সামনে হাত প্রসারিত করা থেকে মুক্ত করে দাও!

(বাদায়েউস সানায়ে খন্ড নম্বর ২ পৃষ্ঠা নম্বর ২৭৩)

বর্তমান যুগে উক্ত কর্মটি মূল্যের মাধ্যমে যতটা সহজ খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে ততটা সহজ নয়। আমরাই নিজে ছোটবেলা খাদ্যদ্রব্য দিয়ে আইসক্রিম ইত্যাদি নিয়েছি। খাদ্যের পরিবর্তে তারা দিয়ে দিতেন; কিন্তু এখন খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্তে কোন জিনিসই দেওয়া-নেওয়া হয় না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সেটা প্রচলন ছিল তাই সেটাই বলেছেন। যেমন হাদিস পাকে আছে কর্মের বদলে খেজুর আদান-প্রদান হয়েছে। আমাদের যুগে সেটা প্রচলন নেই। তাই যেটা প্রচলন তার মাধ্যমে যদি আমরা ফিতরা আদায় করি এটা হাদীসেরই উদ্দেশ্য পালন হবে হাদিসের ব্যতিক্রম হবে না। কোন হাদীসেই এটা লিখা নেই যে, খেজুর গম মুনাক্কা ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্যই দিতে হবে তার মূল্য দিলে হবে না। তিনি শুধু পরিমাণের জন্য উক্ত খাদ্যদ্রব্যের নাম গুলি সম্বোধন করেছিলেন।

২. দলীল:

অনুরূপভাবে তাবেয়ীনদের থেকে খাদ্যশস্যের পরিবর্তে মূল্যসহ সাদকায়ে ফিতর প্রদানের দলীল পাওয়া যায়?।

روى ابن أبي شيبة عن عون قال :سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدى بالبصرة -وعدى هو الوالى :-يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم

(مصنف ابن أبي شيبة، ج2:، ص398 :، ط:مكتبة الرشد، رياض)

অর্থাৎ:-হযরত ইবনে আবি শায়বা হযরত আউন থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমি বসরায় আদী-কে খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজের লিখা পত্র শুনেছি-আদী বাসরার গভর্নর ছিলেন। প্রত্যেকটা ব্যক্তির কাছ থেকে অর্ধেক দিরহাম (রৌপ মুদ্রা) সঞ্চয় করবেন।

(ইবনে আবি শাইবা, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৯৮, আল-রশিদ লাইব্রেরি, রিয়াদ)

৩.দলীল:

عن الحسن قال :لا بأس أن تعطى الدراهم فى صدقة الفطر .(مصنف ابن أبى شيبة، ج2، ص398 :، ط :مكتبة الرشد، رياض

(ইবনে আবি শায়বাহ, ভলিউম: ২, পৃ: ৩৯৮,আল-রশিদ লাইব্রেরি, রিয়াদ)

অর্থাৎ:-হযরত হাসান বাসরী, রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন যে, সাদকায়ে ফিতরে দিরহাম (টাকা) (খাদ্য সামগ্রীর পরিবর্তে) দেওয়া কোন ক্ষতি নেই। এসবের মাধ্যমে উপকারিতা অর্জন করে থাকে। কিন্তু বিশাল ঘন জনসংখ্যায়, খাদ্যশস্যের অস্তিত্ব এতই বিরল যে সাদকায়ে ফিতর প্রদানকারী ব্যক্তির পক্ষে এটি খুঁজে পাওয়া কিছুটা কঠিন এবং দরিদ্র ব্যক্তির জন্যও এটা কষ্টকর হয়ে পড়বে। কারণ, এটি পিষে, তারপর ময়দা তৈরি এবং তারপর তার রুটি সেঁকতে অসুবিধা হবে। অতএব যে ব্যক্তি ন্যায়বিচারের দিকে তাকাবে তার কোন সন্দেহ থাকবে না যে, এই পরিস্থিতিতে সাদকায়ে ফিতরে খাদ্যশস্যের পরিবর্তে মূল্য পরিশোধ করা উত্তম।

ডঃ ইউসুফ কারাযাবী "ফিক্বহুয যাকাত" গ্রন্থে আরো লিখেছেন যে চিন্তা করার পর আমার কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি কারণে খাদ্যশস্যের মাধ্যমে সাদকায়ে ফিতর আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন:

প্রথম কারণ হলো, মানুষের জন্য খাদ্যশস্য দিয়ে সাদকায়ে ফিতর আদায় করা সহজ ছিল।

দ্বিতীয় কারণ হল মুদ্রার মূল্য পরিবর্তিত হয় এবং এর ক্রয়মূল্য সময়ে সময়ে বাড়তে থাকে এবং এর বিপরীতে এক 'সা' পরিমাণ শস্য মানুষের প্রায়োজনীয়তা-কে বেশি পূরণ করে (এবং এর মূল্য অবমূল্যায়ন হয় না)। (তাই যেমন সে যুগে দাতার জন্য এই খাদ্যশস্যের মাধ্যমে সাদকায়ে ফিতর আদায় করা সহজ ছিল এবং গ্রহীতার জন্য এটি অধিকতর উপকারী ছিল)। (তাই আজ খাদ্যশস্যের পরিবর্তে মূল্যের মাধ্যমে সাদকায়ে ফিতর আদায় করা সহজ। দাতার পক্ষেও আদায় করা সহজ এবং প্রাপ্যকের জন্য আরও উপকারী। (ফিক্বহুয যাকাত, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৪৯, আল-রিসালাহ আল-আ'মালী)

প্রাক্তন শায়খ "জামে আযহার মিশর" মাহমুদ শালতুতও মূল্যের মাধ্যমে সাদকায়ে ফিতর প্রদান করা জায়েয সম্পর্কে একটি ফতোয়া জারি করেছেন। তিনি বলেছেন যে মূল্য (টাকা)-র মাধ্যমে সাদকায়ে ফিতর প্রদান করাই যথেষ্ট, কারণ কখনও কখনও মূল্য ফকিরের জন্য আরও আরামদায়ক এবং উপকারী হয় এবং এতে ফকিরের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর সুবিধা ও হয়ে থাকে। যা ফকির নিজেই খুব ভালভাবে জানেন। এবং খাদ্যদ্রব্য পেলে কখনো কখনো পণ্য বিনিময় করার সুযোগ পান না। তাই প্রয়োজন দূর করার সাথে দামের অনেক সম্পর্ক রয়েছে এবং আমি (শায়েখ আযহার) এটিকে আমার জন্য ভাল এবং পছন্দ মনে করি যে আমি যখন শহরে থাকব তখন মূল্য (টাকা) দিয়ে সাদকায়ে ফিতর আদায় করব। আর আমি যদি গ্রামে থাকি তবে গম, কিসমিস, খেজুর ও চাল ইত্যাদি দিয়ে সাদকায়ে ফিতর আদায় করব।

গায়ের মুকাল্লীদ আলেম ও মুহাদ্দিস, শায়েখ হাফিজ জুবায়ের আলী জাঈ, তাবেয়ীনদের রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর লিখেছেন: "এই নিদর্শন অনুসারে, সাদকায়ে ফিতরে মূল্য (টাকা ইত্যাদি) দেওয়া জায়েয, এবং এই ন্যায্যতা শুধুমাত্র তাদের জন্য বিশেষ বিবেচনা করা উচিত যারা ইউরোপে (যেমন গ্রেট ব্রিটেন) এবং আমেরিকা ইত্যাদিতে বসবাস করেন, দরিদ্র দেশগুলি-তে (যেমন পাকিস্তান, (ভারতে) তাদের দরিদ্র আত্মীয়দের সাথে সহযোগিতা করা উচিত এবং মিসকিন দের হক দেওয়া উচিত।(আর এটা টাকার মাধ্যমে সম্ভব) অন্যথায় গম, আটা এবং খেজুরের মতো পণ্য দিয়ে সাদকায়ে ফিতর দেওয়া ভাল এবং এটিই আমরা অনুশীলন করি পাকিস্তানে."

(ফাতাওয়া ইলমিয়া আল-মারুফ, তাউযীহুল আহকাম, খন্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১৫৪)

এ সমস্ত বিশদ বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, হানাফীদের মত বর্তমান সময়ে অনুসরণ করা সহজ এবং এটাই হাদীসের মূল উদ্দেশ্য মুওয়াফিক। গরীবদের অবস্থার ক্ষেত্রেও এতে সুবিধা রয়েছে এবং সদকায়ে ফিতর আদায় করার উদ্দেশ্যই গরিব মিসকিনদের সুবিধা করে দেওয়া। যেমন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

أَغْنُوهُمْ عَنْ الْمَسْأَلَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ

অর্থাৎ:-এই দিনে (ঈদের দিনে) গরিব মিসকিনদের কে কারো সামনে হাত প্রসারিত করা থেকে মুক্ত করে দাও!(বাদায়েউস সানায়ে খন্ড নম্বর ২ পৃষ্ঠা নম্বর ২৭৩)

আর এটা বর্তমান যুগে মূল্য দিয়ে যতটা সম্ভব খাদ্য দ্রব্য দিয়ে ততটা সম্ভবপর হতে পারে না। তাই খাদ্যের পরিবর্তে মূল্য (টাকা) সাদকায়ে ফিতর প্রদান করা না শুধুমাত্র অনুমোদিত, বরং উত্তম।

আ'লা হযরত বিদ'আতের বিনাশকারী ছিলেন

মুফতী গুলজার আলী মিসবাহী সনিয়র শিক্ষকঃ এম.জি.এফ.মাদীনাতুল উলূম, খালতিপুর, কালিয়াচক, মালদা।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

অনুবাদ:- নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এই উম্মতের জন্য এমন মহাপুরুষকে আবির্ভূত করবেন, যিনি তাদের জন্য ধর্মকে সঞ্জীবিত করবেন"। (আবূ দাউদ,৪/১০৯, বৈরুত)

হযরত মুল্লা আলী ক্বারী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

على رأس كل مائة سنة اى انتهائه او ابتدائه اذ قل العلم والسنة و كثر الجهل

অর্থাৎ:- প্রত্যেক শতাব্দীর শেষে অথবা শুরুতে আসবেন। যখন ইলম এবং সুন্নাত এর চর্চা কম হয়ে যাবে এবং মূর্খতা ও বিদআত বৃদ্ধি পাবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ ১/৩২১)

যত মুজাদ্দিদ এ ধরায় এসেছেন তাদের জীবন যদি আপনি লক্ষ্য করেন তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে, তারা সকলেই এসে মৌলিকভাবে দুটি কাজ করেছেন। একটি সুন্নতের প্রচার অপরটি বিদআত ও কুসংস্কারের বিরোধিতা।

বিশেষভাবে হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু যেভাবে বিদআত ও কুসংস্কারের বিরোধিতা করেছেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তিনি সারাটি জীবন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মজবুত করে নিজের কলম ধরে রেখেছিলেন।

অথচ সম্প্রতি কিছু ওহাবী তথাকথিত আহলে হাদীস ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত আশ-শাহ ইমাম আহমদ রেযা খাঁন রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি অপবাদ দেয় যে, তিনি বিদআতের প্রচারক ছিলেন (মাআযাল্লাহ)। তারা বলে যে, সুন্নীদের মধ্যে যে সমস্ত কুসংস্কার রয়েছে, সেগুলো আহমদ রেজা খাঁনের দেওয়া শিক্ষা (নাউযুবিল্লাহ)।

কিন্তু যে ব্যক্তি বাস্তবে আ'লা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর কিতাবাদি অধ্যয়ন করেছে, সে নিশ্চয়ই জানে যে, আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর এটা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা অপবাদ। বাস্তবতার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। আলা হযরত বিদআতের পক্ষে নয় বরং বিপক্ষে ছিলেন। তিনি নিজের সারাটা জীবন কাটিয়েছেন সুন্নাতের প্রচার করে ও কুসংস্কারের বিরোধীতা করে।

তিনি যে বিদআত ও কুসংস্কারের বিনাশকারী ছিলেন এটা তাঁর লেখনীর মাধ্যমেই প্রমাণ হয়ে যায়। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি:

(১) মাযারে সাজদাহ করা হারাম

সাজদাহ দুপ্রকার (১) এবাদতের সাজদাহ (২) সম্মানার্থে সাজদাহ

এবাদতের সাজদাহ কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে এবাদতের উদ্দেশ্য সাজদাহ করা শির্ক। যে করবে সে মুশরিক হয়ে যাবে।

সম্মানার্থে সাজদাহ করা পূর্বের কিছু শরীয়াতে জায়েয ছিল। যেমন-

হযরত আদম আলাইহিস সালামকে ফিরিশতাগণ সাজদাহ করেছেন। (আল ক্বোরআন)

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তাঁর ভায়েরা সাজদাহ করেছেন। (আল ক্বোরআন) তখন সম্মানার্থে সাজদাহ করা জায়েয ছিল কিন্তু শেষ নবীর শরীয়াতে সম্মানার্থে সাজদাহ করাকেও হারাম করে দেয়া হয়েছে।

কিছু নামধারী আহলে হাদীস আলা হযরতের উপর অপবাদ দেয় যে, তিনি মাযারে সজদাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন (আস্তাগফিরুল্লাহ)। এটা কত বড় মিথ্যা কথা। হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

"খোদা ব্যতীত অন্য কাউকে এবাদতের উদ্দেশ্য

সাজদাহ করা হল শির্ক। সম্মানার্থে সাজদাহ করা শির্ক নয় তবে হারাম ও গুনাহে কবীরা (বড় গুনাহ)।"

(ফাতাওয়া রাযাবীয়ারহ ২২/৫৬৫)

তিনি ফাতাওয়ে আযীযিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, সম্মানার্থে সাজদাহ করা হারাম হওয়ার প্রসঙ্গে এউম্মতের ইজমা রয়েছে।

(ফাতাওয়া রাযাবীয়ারহ, ২২/৫৬৫)

এর পরেও যদি কোন ওহাবী বলে যে, আহমদ রেযা খাঁন মাযারে সাজদাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন, সে কত বড় যালিম হবে!

(২) মাযারে তাওয়াফ করা হারাম

আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

"সম্মানার্থেও মাযারের তাওয়াফ করা নাজায়েয। সম্মানার্থে তাওয়াফ কেবলমাত্র কা'বা শরীফের সাথেই নির্দিষ্ট।"

(ফাতাওয়া রাযাবীয়ারহ ৯/৫২৮)

আর একজায়গায় বলেন:

"কা'বা শরীফ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর সম্মানার্থে তাওয়াফ করা নাজায়েয।"

(ফাতাওয়া রাযাবীয়ারহ ২২/৩৮২)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাযার শরীফের তাওয়াফ করা প্রসঙ্গে বলেন:

"রওযায়ে আনোয়ারের তাওয়াফ করবে না। সাজদাহ করবে না। এতটাও ঝুঁকে পড়বে না যে, রুকুর সমান হয়ে যায়। হুযূর নবীয়েকরীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান হল তাঁর অনুসরণ করা।"

(ফাতাওয়া রাযাবীয়ারহ ১০/৭৬৯)

(৩) কবরের দিকে দাঁড়িয়ে নামায পড়া হারাম

আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু ফাতাওয়া রাযাবীয়ারহ-এর মধ্যে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: কবরের দিকে বিনা আড়ালে নামায পড়বে না, না তার (কবরের) উপওে বসবে।

(ফাতাওয়া রাযাবীয়ারহ ২২/৪৫১)

(৪) কাল্পনিক মাযার তৈরি করা নাজায়েয

কিছু অশিক্ষিত লোক স্বপ্নে দেখে মাযার তৈরি করে। এদের ব্যাপারে হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

"কাল্পনিক মাযার বানানো এবং তার সাথে মাযারের ন্যায় কর্ম করা নাজায়েয ও বিদ'আত। এবং শরীআতের খেলাফ, স্বপ্নের কোনো কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।" (ফাতাওয়া রাযাবীয়ারহ ৯/৪২৫)

(৫) কবরের উপর আগরবাতি ও মোমবাতি

কিছু লোক কবরের উপর মোমবাতি জ্বালিয়ে দেয়। কিছু লোক আগরবাতি জ্বালায়। এ প্রসঙ্গে হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

"কবর সমূহের দিকে প্রদীপ/ মোমবাতি নিয়ে যাওয়া হল বিদআত ও সম্পদের অপচয়। উদ (একধরনের খড়ি যা থেকে সুগন্ধি পাওয়া যায়) এবং আগরবাতি ইত্যাদি ঠিক কবরের উপর রেখে জ্বালানো থেকে বিরত থাকবে। কেননা, এতে সম্পদ অপচয় হয়। হুযূর আলা হযরত একটি হাদীস বয়ান করে বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কবরে যাতায়াতকারী মহিলাদের উপর এবং কবর সমূহের উপর মসজিদ নির্মাণকারীদের প্রতি এবং যারা কবরের উপরে মোমবাতি জ্বালায় তাদের উপরে অভিশাপ জানিয়েছেন। (তিরমিযী)

এ হাদীস নকল করার পর তিনি বলেন:

"এই অভিশাপ ওই লোকদের উপর দিয়েছেন, যারা বিনা কোন কারণে কবরসমূহের ওপর মোমবাতি জ্বালায়। তবে যদি কেউ কবরের নিকটে এজন্য মোমবাতি জ্বালায় যে, সেখানে যাতায়াতকারীদের জন্য আলো হয় অথবা যদি কেউ সেখানে বসে ক্বোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করতে চায় তাহলে করতে পারে, এ পরিপ্রেক্ষিতে নিষেধ নেই। তবে উত্তম হল যে, প্রদীপ অথবা মোমবাতি কবরের উপরে যেন না রাখে বরং কিছুটা কবর থেকে দূরে রাখে।

(ফাতাওয়া রাযাবীয়ারহ ৯/৪৯১)

(৬) বে-পরদা হয়ে পীরের কাছে যাওয়া

কিছু অজ্ঞ ও মূর্খ ব্যাক্তিরা মনে করে যে, পীর সাহেব তো বাপের মতো। তাঁর কাছে বে-পর্দা হয়ে গেলে কি হবে! এসব শয়তানদের ধোঁকাবাজি মাত্র। পরপুরুষ আলিম হোক অথবা পীর তাঁর কাছে বেপর্দা হয়ে অবস্থান করা শরীআতের মধ্যে হারাম।

এপ্রসঙ্গে হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

"পর্দার ব্যাপারে চাই পীর হোক বা না হোক পরপুরুষ হলে সকলের হুকুম একই। পীরের কাছে যুবতী মহিলার চেহারা খুলে যাওয়াও নিষেধ।"

(ফাতাওয়া রাযাবীয়ারহ ২২/২০৫)

আর এক জায়গায় বলেন:-"যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢেকে রাখা ফরয, তার মধ্য থেকে যদি কোন অঙ্গ খোলা থাকে, যেমন- মাথার চুলের কোন অংশ অথবা গলা অথবা হাতের কব্জি অথবা পেট অথবা পায়ের গোড়ালির কোন অংশ তাহলে এ অবস্থায় মহিলার ক্ষেত্রে পর পুরুষের সামনে যাওয়া শর্তমুক্তভাবে হারাম, চাই সে পীর হোক অথবা আলিম।" (ফাতাওয়া রাযাবীয়াহ ২২/২৩৯-২৪০)

(৭) উরসের নামে মেলা লাগানো

হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, উরস পালন করার জন্য শরীআতের নিষেধাজ্ঞা বিষয়বস্তু হতে দূরে থাকা জরুরী। বিস্তারিত দেখুন ফাতাওয়া রাযাবীয়াহ ৯/৪২২

হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, বুযুর্গানে দ্বীনের উরসের মধ্যে যে নাজায়েয কর্মগুলি করা হয় এতে কি তাদের কষ্ট হয়?

এর উত্তরে তিনি বলেন:

"নিশ্চয়ই (তাদের কষ্ট হয়)। এ কারণেই বর্তমানে তেমনভাবে দৃষ্টিপাত করেন না। তা না হলে আগে যেভাবে তাঁদের দরবার থেকে বরকত পাওয়া যেত, এখন আর কোথায়!" (আল মালফুয ৩/৪৬)

(৮) মাযারে চুমু দেওয়া থেকেও বেঁচে থাকা উচিত

মাযারে চুমু দেয়া প্রসঙ্গে হুযূর আলা হযরত বলেন:

"মাযারে চুমু দেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। এতে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। বেঁচে থাকা ভালো। এতেই অধিক পর্যায়ের আদব বিদ্যমান।"

(ফাতাওয়া রাযাবীয়ারহ ৯/৫২৮)

(৯) মহিলাদের মাযারে যাওয়া নিষেধ

হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

"সঠিক কথা হল যে, মহিলাদের কবর জিয়ারতের জন্য যাওয়া জায়েয নেই।"

(ফাতাওয়া রাযাবীয়ারহ ৯/৫৩৭)

(১০) উরসে আতিশবাজি বা পটাকা ফাটানো

বুযুর্গানে দ্বীনের পবিত্র উরস সমূহের মধ্যে সম্প্রতি বিভিন্ন ধরনের কুকর্ম শুরু হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হল পটাকা ফাটানো। এ ব্যাপারে আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

"বুযুর্গানে দ্বীনের উরসের মধ্যে রাত্রিবেলা পটাকা ফাটানো এবং বিনা প্রয়োজনে অতিরিক্ত আলো করা এবং ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে যে খাবার রান্না করা হয়েছে তা ছিটিয়ে দেওয়া, যা লুণ্ঠন কারীদের পায়ে পড়ে কয়েক মন (খাবার) নষ্ট হয়ে মাটির সাথে মিশে যায়। উরস কমিটি উক্ত কাজকে গর্বের বিষয় এবং বরকতময় মনে করে থাকে। পবিত্র শরীআতে এর হুকুম কি রয়েছে?

এর উত্তরে হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

"পটাকা ফাটানো হলো অপচয়। আর অপচয় করা হল হারাম। এইভাবে খাওয়ার ছিটিয়ে দেওয়া বেয়াদবি এবং বেয়াদবি (বুযুর্গানে দ্বীনের ফেইয ও বরকত হতে) বঞ্চিত করে। এতে সম্পদ নষ্ট করা হয় আর সম্পদ নষ্ট করা হল হারাম।" (ফাতাওয়া রাযাবীয়ারহ ২৪/১১২)

(১১) উরসের আশেপাশে নাচানাচি করা

আজকাল প্রায় উরসকে মেলায় পরিণত করে দেওয়া হচ্ছে। মাজারের আশেপাশেই গান-বাজনা হচ্ছে নাচানাচি হচ্ছে। এ বিষয়ে হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

"বেশ্যাদের নাচানাচি করা নিশ্চিতরূপে হারাম। আউলিয়ায়ে কেরামের উরস সমূহের মধ্যে জাহিলেরা এসব কু-কর্ম আরম্ভ করেছে।"

(ফাতাওয়া রাযাবীয়ারহ ২৯/৯৩)

(১২) জাহিল খাদিমদের নেশা করা

সম্প্রতি কিছু জাহিল খাদিম মাযারের পাশে বসে বিভিন্ন ধরনের নেশা করে। এদের ব্যাপারে হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

"নেশা প্রকৃতভাবে হারাম। নেশা জাতীয় জিনিস পান করা নেশাখোরদের সাদৃশ্য হয় যদিও বা নেশার সীমা পর্যন্ত পৌঁছায়নি। এটাও পান করা গুনাহ; এমনকি ওলামায়ে কেরাম এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, শুধুমাত্র নরমাল পানি মদের মতো করে পান করাও হারাম। হ্যাঁ, যদি ঔষুধের জন্য কোন কিছু মিশ্রিত করে আফিম বা মাদক বা সরস এতোটুকু অংশ মিশ্রিত করা হয় যার কারণে মস্তিষ্কে প্রভাব না পড়ে, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। বরং আফিম সামান্যতম খাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত।"

(আহকামে শরীআত ২/১৭৮ নেযামিয়া কিতাব ঘর লোহোর)

(১৩) বাদ্যযন্ত্র সহ কাওয়ালী নিষিদ্ধ

আজকাল কাওয়ালী নিয়ে অনেক বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছে। যদিও কিছু ওলামায়ে কেরাম শর্ত সাপেক্ষে কাওয়ালীকে জায়েয বলেছেন কিন্তু বর্তমানের অধিকাংশ কাওয়ালী সেই শর্ত মেনে করা হয় না।

এ ব্যাপারে হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

"মাযামীর তথা বাদ্যযন্ত্র ক্রীড়া কৌতুক হল হারাম।ওলামায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরাম উভয় পক্ষ এর হারাম হওয়া ব্যাপারে স্পষ্ট করেছেন।

(ফাতাওয়া রাযাবীয়ারহ ২৪/ ৭৯-৮০)

হযরত সৈয়দ ফাখরুদ্দীন (খলিফায়ে হুযূর মাহবুবে এলাহী) রহমতুল্লাহি আলাইহি বাদ্যযন্ত্র সহ কাওয়ালী করাকে নাজায়েয প্রমাণ করেছেন। বিস্তারিত জানতে তাঁর কিতাব كشف القناع عن اصول السماع অধ্যয়ন করুন।

হযরত শারফুল মিল্লাত ওয়াদ দ্বীন ইয়াহিয়া মুনিরী কুদ্দিসা সিররুহু বাদ্যযন্ত্রকে যেনার সাথে তুলনা করেছেন।

(আহকামে শরীআত বাংলা ১৪৮)

(১৪) বুযুর্গানে দ্বীনের ফটোতে মালা পরানো হারাম

কিছুদিন থেকে কিছু জাহিল মুরীদ নিজ নিজ বাড়িতে ও দোকান ইত্যাদিতে বুযুর্গানে দ্বীনের বানোয়াট বা আসল -

ফটো রেখে সকাল সন্ধ্যা ফুলের মালা পরিয়ে বরণ করতে শুরু করেছে। সে কত বড় শরীয়াত লংঘনকারী। অন্ধ ভক্ত হলে মানুষ এরকম হয়। প্রথমত জীবের ফটো প্রিন্ট করা সর্বসম্মতি ভাবে নাজায়েয ও হারাম। তারপর আবার সেই ফটোর উপরে ফুলের মালা ইত্যাদি পরিয়ে দেওয়া আরো চরম পর্যায়ের হারাম।

এ ব্যাপারে হুযূর আলা হযরত বলেন:

"আল্লাহ তা'আলা যেন ইবলিসের ধোঁকাবাজি থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। দুনিয়াতে মূর্তি পূজা এভাবেই শুরু হয় যে, কিছু লোক নেক বান্দাদের ভালোবাসায় তাদের ফটো বানিয়ে বাড়িতে এবং দোকান সমূহের মধ্যে তাবারুক হিসাবে রাখতে শুরু করে। তাদের ফটো রেখে আল্লাহর এবাদত করে মজা পাবে বলে। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই ফটো কেই তারা মা'বুদ অর্থাৎ খোদা বানিয়ে ফেলে (আস্তাগফিরুল্লাহ্)। (ফাতাওয়া রাযাবীয়ারহ ২৪/৫৭৪)

(১৫) প্রচলিত তাজিয়া নাজায়েয

আ'লা হাযরাত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন:

"প্রচলিত তাজিয়া নাজায়েয ও বিদআত এবং তা বানানো গুনাহ।"

(ফাতাওয়া রাযাবীয়াহ, খন্ড: ২৪, পৃষ্ঠা: ৫০১)

আরও বলেন:

"প্রচলিত তাজিয়া মন্দ ও খারাপ বিদআত। তা বানানো এবং দেখা কোনটাই জায়েয নয়। আর সম্মান করা ও বিশ্বাস রাখা কঠিন হারাম এবং জঘন্যতম পর্যায়ের বিদআত।" (ফাতাওয়া রাযাবীয়াহ, খন্ড: ২৪, পৃষ্ঠা: ৪৯০)

আর এক জায়গায় বলেন:

"যেহেতু তাজিয়া বানানো নাজায়েয, এজন্য নাজায়েয কর্মের তামাশা দেখাও নাজায়েয।"

(মালফুযাতে আলা হাযরাত, পৃষ্ঠা: ২৮৬)

তিনি আরও বলেন:

"ঝান্ডা (নিশান), তাজিয়া, আসন, মেহেদী, তার মান্নত, ঘোরাফেরা, নৈবেদ্য, ঢোল, বাজনা, শোকগাথাঁ, বিলাপ, মাতম, বানোয়াট কারবালায় যাওয়া, মহিলাদের তাজিয়া দেখার জন্য বের হওয়া এসব কথা হারাম, গুনাহ, নাজায়েয ও নিষেধ।"

(ফাতাওয়া রাযাবীয়াহ, খন্ড: ২৪, পৃষ্ঠা: ৪৯৯)

(১৬) ইমাম বাড়া তৈরি করা বিদআত

হুযূর আ'লা হাযরাত রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন:

"কারবালা কেন্দ্রিক প্রচলিত ইমাম বাড়ার ঘর (বানানো) বিদ'আত ও নিষিদ্ধ" ملخصا (ফাতাওয়া রাযাবীয়াহ, খন্ড: ২৪,পৃষ্ঠা:৪৯৭, প্রকাশিত: রেযা একাডেমী, মুম্বাই)

আর এক জায়গায় বলেন:

"ইমাম বাড়ার জন্য ওয়াক্ফ (দান) হতে পারে না। সেটা যে বানিয়েছে তারই মালিকানা রয়েছে। তার অধিকার আছে তাতে যা চাইবে করবে। আর সে না থাকলে তার ওয়ারিসদের মালিকানা হবে, তাদের অধিকারে থাকবে।" (ফাতাওয়া রাযাবীয়াহ, খন্ড:-১৬, পৃষ্ঠা:-১২২, প্রকাশিত: রেযা একাডেমী, মুম্বাই))

(১৭) মহরম আসলেই কিছু লোক ঢোল বাজাতে আরম্ভ করে।

ঢোল-বাজনা শরীয়াতে সম্পূর্ণ ভাবে হারাম। এ প্রসঙ্গে হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

"ঢোল বাজানো হল হারাম"

(ফাতাওয়া রাযাবীয়াহ ৯/১৮৯)

(১৮) তাজিয়ার কাছে মান্নত করা বাতিল

হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

"তাজিয়ার কাছে মান্নত করা বাতিল ও নাজায়েয।"

(ফাতাওয়া রাযাবীয়াহ ২৪/৫০১)

(১৯) মহরমের কিছু কুসংস্কার

হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

"মুহাররামুল হারামের প্রথম দশ দিনে রুটি না তৈরি করা, বাড়িতে ঝাড়ু না দেয়া, পুরাতন কাপড় পরিধান করা, ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ব্যতীত কারো ফাতিহা না করা, মেহেন্দি লাগানো, এসমস্ত কথা হল মূর্খতার পরিচয়।" (ফাতাওয়া রাযাবীয়াহ ২৪/৪৮৮)

(২০) মহরমে মেলা লাগানো হারাম

হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

"আশুরার মেলা হল অনর্থক ও কৌতুকানন্দ এবং নিষিদ্ধ।"

(ফাতাওয়া রাযাবীয়ারহ ২৪/৫০১)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দিবালকের ন্যায় প্রতিয়মান হল যে, হুযূর আ'লা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু বিদআতের প্রচারক নয় বরং বিদাতের বিনাশকারী ছিলেন। তিনি সারাজীবন কুসংস্কার ও বিদআতের বিরোধিতা করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তাঁর ওসীলায় আমাদের মাগফিরাত করেন, আমীন।

সমাপ্ত

মৌখিক নিয়ত করার বিধান

মুফতী মুহাম্মাদ রাফিক আলাম বারকাতী মিসবাহী

জামিয়া রাযাভিয়া পঞ্চানন্দপুর, মোথাবাড়ি, মালদা।

নিয়ত : আন্তরিক দৃঢ়তাপূর্ন ও সিদ্ধান্ত মূলক ইচ্ছাকে নিয়ত বলা হয়। যাবতীয় আমলের মূল ও ভিত হচ্ছে নিয়ত।

হজরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوَى

সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভর করে এবং প্রতিটি কর্মের ফল প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিয়ত অনুযায়ী দেওয়া হবে"।

(বুখারী শরীফ প্রথম হাদীস)

উক্ত হাদিস শরীফ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ও অন্যান্য এবাদতের জন্য আন্তরিক নিয়ত একান্ত জরুরী। আন্তরিক নিয়তই হচ্ছে ফরয। মৌখিক নিয়ত কেবল মুস্তাহাব। কিন্তু বর্তমানে কিছু মৌ-লোভীরা মৌখিক নিয়তকে অমান্য করে বিদআতের লিস্টে ফেলে দেয়। তারা বলে মৌখিক নিয়ত করা নাকি জায়েয নয়।

আসুন দেখি, কোরআন ও হাদিস দ্বারা রচিত ফিক্বহ শাস্ত্রের লেখকগণ এ ব্যাপারে কি বলেন। বিশ্বব্যাপী খ্যাতি সম্পন্ন ও মান্যতা প্রাপ্ত, ৮০০ বছর পূর্বে লেখা ফিক্বহ্ গ্রন্থ "হেদায়া"র লেখক শাইখুল ইসলাম ইমাম বুরহানুদ্দীন আলী বিন আবু বকর রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি (ইন্তেকাল ৫৯৩ হিজরী) লিখেন-

ويحسن ذالك لاجتماع عزيمته

অর্থাৎ-আন্তরিক নিয়াতের দঢ়তার স্বার্থে মৌখিক নিয়ত করা উত্তম"।

(হেদায়া আওয়ালাইন পৃষ্ঠা নম্বও ৯৫)

৮০০ বছর পূর্বে ইমাম বুরহানুদ্দীন আলী বিন আবু বকর রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি লিখে গেছেন মৌখিক নিয়ত করা জায়েয উত্তম। আর এরা আজকে বলছে জায়েজ নয়। কি অবাক কান্ড!

ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মাহমুদ আল মুসিলি রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি (ইন্তেকাল ৬৮৩ হিজরী) ইমাম মুহাম্মদ বিন আল হাসান শাইবানী রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি এর কওল বর্ণনা করেন

قال محمد بن الحسن :النية بالقلب فرض و ذكرها باللسان سنة و الجمع بينهما افضل

অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মদ বিন আল হাসান রহমাতুল্লাহি তা'য়ালা আলাইহি বলেন আন্তরিক নিয়ত ফরজ, মৌখিক নিয়ত সুন্নাত এবং আন্তরিক ও মৌখিক দুটো নিয়ত একত্রে করা উত্তম"।

(ইখতিয়ার লি তা'লিলিল মুখতার প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নম্বর ১৫৭)

ইমাম মোহাম্মদ বিন আল হাসান শাইবানি রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি, যিনি ইমামে আজম আবু হানিফা নো'মান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর একজন সুযোগ্য ছাত্র যিনি একজন মুজতাহিদ ফিল মাযহাব (জন্ম ১৩১ হিজরী, ইন্তেকাল ১৮৯ হিজরী)

আজ থেকে প্রায় সাড়ে বারো শত বছর পূর্বে বলে গেছেন মৌখিক নিয়ত করা সুন্নাত। তিনি কি বুঝেননি? তাঁর কি বোধের অভাব ছিল? তখন তো বড় বড় তাবেয়ীগণ জীবিত ছিলেন। কেউ এ ব্যাপারে কোনো রকমের মন্তব্য করেননি। কিন্তু আজ ভাড়াটে মৌ-লোভীরা একটি জায়েয কাজকে নাজায়েয বলে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আল কাশগারি রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি (ইন্তেকাল ৭০৫ হিজরী) মৌখিক নিয়ত করা সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করেন

يستحب ان ينوى بقلبه و يتكلم بلسانه و هو المختار

অর্থাৎ আন্তরিক নিয়তের সাথে সাথে মৌখিক নিয়ত করা মুস্তাহাব এবং এটি সঠিক ও পছন্দনীয় মত"। (মুনয়াতুল মুসাল্লী পৃষ্ঠা নম্বর ১৬৫) তিনি প্রায় সাত শত বছর পূর্বে আন্তরিক নিয়তের সঙ্গে মৌখিক নিয়ত করা মুস্তাহাব বলে ঘোষণা করেছেন।

ইমাম আবু বকর বিন আলী বিন মুহাম্মদ আল হাদ্দাদ রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি (ইন্তেকাল ৮০০ হিজরী) লিখেন

السنة أن يتلفظ بها بلسانه فيقول إذا نوى من الليل :نويت أن اصوم غدا لله تعالى من فرض رمضان وان نوى من النهار يقول :نويت أن اصوم هذا اليوم لله تعالى من فرض رمضان

অর্থাৎ আন্তরিক নিয়তকে মৌখিক উচ্চারণ করা সুন্নাত অতএব রাতে নিয়ত করলে এরূপ বলবে : আমি আল্লাহ পাকের নিমিত্তে আগামীকাল রমজান মাসের ফরজ রোজার নিয়ত করলাম। এবং দিনে নিয়ত করলে এরূপ বলবে : আমি আল্লাহ পাকের নিমিত্তে আজ রমজান মাসের ফরজ রোজার নিয়ত করলাম"।

(আল জাওহারাতুন নাইয়িরাহ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নম্বর ৩২৯)

ইমাম আবু বকর রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি প্রায় সাড়ে ছয় শত বছর পূর্বে রমজান মাসের ফরজ রোজার মৌখিক নিয়ত করা সুন্নাত লিপিবদ্ধ করে, মৌখিক নিয়তের শব্দগুলিও বলে দিয়েছেন।

আল মুহাক্কিক ইমাম আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি (ইন্তেকাল ১০৬৮ হিজরী) লিখেন

ضم التلفظ إلى القصد افضل .لما فيه من استحضار القلب لاجتماع العزيمة به .قال محمد بن الحسن :النية بالقلب فرض و ذكرها باللسان سنة و الجمع بينهما افضل

অর্থাৎ আন্তরিক নিয়তকে মৌখিক উচ্চারণ করা উত্তম কেননা তাতে আন্তরিক নিয়ত মজবূত হয়। ইমাম মুহাম্মদ বিন আল হাসান রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি ইরশাদ করেন, আন্তরিক নিয়ত ফরজ ও সেটি মৌখিক উচ্চারণ করা সুন্নাত এবং উভয় নিয়ত একসাথে উত্তম"।

(মাজমাউল আনহুর প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নম্বর ১২৮)

আল ফাক্বীহ ইমাম হাসকাফী মুহাম্মদ বিন আলী রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি ইন্তেকাল ১০৮৮ হিজরী, এবং ইমাম ইবনে আবেদীন শামী মুহাম্মদ আমীন বিন উমর রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন

و التلفظ بها مستحب و قيل سنة يعنى احبه السلف أو سنة علماء نا

অর্থাৎ নিয়ত মৌখিক ভাবে উচ্চারণ করা মুস্তাহাব এবং মৌখিক উচ্চারণ সুন্নাত বলা হয়েছে মানে পূর্বের আকাবেরীন উলামায়ে কেরামগণ ও ফোক্বাহায়ে এযামগণ মৌখিক নিয়ত পছন্দ করেছেন অথবা মৌখিক নিয়ত আমাদের উলামায়ে কেরামগণের তারিকা"।

(দুর্রে মুখতার মাআ রাদ্দুল মুহতার দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা নম্বর ৯২)

এছাড়া আরও অন্যান্য ফিক্বহ্ শাস্ত্র মৌখিক নিয়ত করা মুস্তাহাব বলে প্রমাণ্য।

তবে একথা আমাদের সকলের মনে রাখতে হবে যে, আন্তরিক নিয়তই হচ্ছে প্রকৃত নিয়ত এবং সেটাই ফরজ। মৌখিক

নিয়ত করা কেবল মুস্তাহাব এবং মৌখিক নিয়ত যে কোনো ভাষাতে উচ্চারণ করা জায়েজ।

হাদিস শরীফে এসেছে

عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ.

অর্থাৎ হযরত আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি পৃথিবীতে দুমুখো হবে কেয়ামতের দিনে তার দুটি আগুন যুক্ত জিহ্বা হবে"।

(আবু দাউদ শরীফ কিতাবুল আদাবি ওয়াল আখলাক হাদীস নম্বর ৪৮৭৩)

অর্থাৎ মুখে এক অন্তরে আর এক। উক্ত হাদিস শরীফ দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মুখ এবং অন্তর দুটিকে একই রাখতে হবে। এবং দুমুখো নীতি মুনাফিকদের আলামত। তারা মুখে এক বলে আর অন্তরে আর এক চিন্তা ভাবনা পোষন করে। সুতরাং আমাদেরকে যে কোনো কাজ কর্ম করতে গিয়ে দুমুখো নীতি থেকে বাঁচতে হবে। এবং আন্তরিকতার সঙ্গে মৌখিকতার মিল রেখে চলতে হবে।

উক্ত হাদিস শরীফ সহ উপরোক্ত সমস্ত দলিলাদি থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আন্তরিক নিয়ত ও ইচ্ছাকে মৌখিকভাবে উচ্চারণ ও প্রকাশ করা জায়েজ ও মুস্তাহাব। ফলে রোজা সহ অন্যান্য এবাদতের জন্য আন্তরিক নিয়তের সাথে মৌখিক নিয়ত করা মুস্তাহাব।

আস-সুন্নাহ প্রকাশনী

বাংলা, ইংলিশ, উর্দু ও আরবী ভাষায়
বই অথবা ম্যাগজিন
কম্পোজ করার জন্য
যোগাযোগ করুন।

মাওলানা-রৌশন আলী আশরাফী

9733301647

www.keyofislam.com

রোজার উদ্দেশ্য ও তা থেকে অবহেলার ফলাফল

মুফতী মোহাম্মদ রফিকুল খান গোয়ালমাল, মুরারই, বীরভূম।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ওই ব্যক্তির নাক ধুলিসাৎ হোক, যার কাছে আমার আলোচনা হল, অথচ সে আমার উপর দরুদ পাঠ করল না। এবং ওই ব্যক্তির নাক ধুলিসাৎ হোক, যার কাছে রমজান শরীফের মাস এল, অতঃপর তার মাগফেরাতের পূর্বেই তা অতিবাহিত হয়ে গেল। এবং ওই ব্যক্তির নাক ধূলিসাৎ হোক, যে নিজের বাবা মাকে বৃদ্ধা অবস্থায় পেল আর তার বাবা-মা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালো না। ১

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমজান শরিফের মাস, কতইনা বরকতপূর্ণ, যেখানে মাগফেরাতের মুজদা (সুসংবাদ) শোনানো হয়। অথচ যদি এই মাসে গুনাহে লিপ্ত থাকা হয় এবং নিজের বদ আমলের ক্ষমা আল্লাহ তায়ালার কাছে না চেয়ে শুধু অন্যান্য দিনের মতো অবহেলায় এই মাসকেও পার করে দেওয়া হয়। তাহলে এর চাইতে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে? তাই রমজান শরীফকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি বড় নেয়ামত এবং ক্ষমা লাভের সুযোগ মনে করা উচিত।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে। যেমন পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল। যাতে তোমাদের পারহেজগারী অর্জিত হয়। ২

এখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন পারহেজগারী অর্জন করার জন্য তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে?

তাহলে বোঝা গেল যে, যদি রোজা রেখে পারহেজগারী অর্জিত না হয় তাহলে রোজা রাখার উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হবে না। আর আল্লাহু আকবার যদি রোজাই ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে তো তার মত আর ক্ষতি হতে পারে না। এ ব্যাপারে হাদিস শরীফের মধ্যে কি বর্ণিত হয়েছে শুনুন।

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবীদের শিরোমণি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ রয়েছে, যে ব্যক্তি রমজান মাসের একদিনের রোজার শরীয়তের বিনা অনুমতি ও বিনা অসুস্থতায় ইফতার করল (ছেড়ে দিল), তার পুরো জীবনেরর রোযা দিয়েও এর ক্ষতিপূরণ হবে না। যদিও সে জীবনভর রোযা রাখে। ৩

অর্থাৎ রমজান মাসের রোজার যে সওয়াব সেটা কখনোই অর্জিত হবে না। ৪

পিয় ইসলামী ভায়েরা! দেখলেন তো রমজান মাসের কত মর্যাদা, সারা জীবন রোজা থাকা সত্ত্বেও রমজান মাসে একটি রোজার সমতুল্য সওয়াব অর্জিত হয় না । যদিও তার কাজা আদায় করলে গুনাহ থেকে বেঁচে যায়।

যারা কোন মাজবুরি (বাধ্যতা) ছাড়াই রোজা ভেঙে দেয় তাদের জন্য কত বড় শাস্তি রয়েছে একবার পড়ুন এবং আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করুন।

হযরত সাইয়েদুনা আবু ওমামা বাহেলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি দোজাহানের সরদার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, (তিনি বলেন) আমি ঘুমিয়ে ছিলাম এমত অবস্থায় স্বপ্নে দুই ব্যক্তি আমার কাছে আসলেন এবং একটি দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে গেলেন। যখন আমি পাহাড়ের সমতল জায়গায় পৌছালাম তখন বিকট আওয়াজ আসছিল। আমি বললাম, এটা কেমন আওয়াজ? আমাকে বলা হলো এটা জাহান্নামীদের আর্তনাদ অতঃপর আমাকে আরো আগে নিয়ে যাওয়া হল।

তো আমি এমন কিছু লোকের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করলাম যাদেরকে গোড়ালির শিরার দ্বারা বেঁধে উল্টো ভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে। এবং তাদের চোয়াল ফেড়ে দেওয়া হয়েছে যা থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কোন ধরনের ব্যক্তি তো আমাকে বলা হলো এরা সময়ের পূর্বে রোজা ইফতার করে নিত অথচ ইফতার করা হালাল ছিল না।৫

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো কত বড় ভয়ানক আযাব তাদের জন্য যারা রোজা ভঙ্গ করে দেয়। সময়ের পূর্বে ইফতার করা এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, অকারণে শরয়ী কারণ ছাড়াই রোজা ভেঙে দেওয়া। যারা বিনা কারণে রোজা রাখার পরে আবার ভঙ্গ করে দেয় তারা ভীষণ গুনেহগার এবং তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে।

হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত তাজদারে মদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খুশবুদার ইরশাদ রয়েছে, যে রমজান শরীফের মাস পেল, তা সত্ত্বেও রোজা রাখলো না সে বদ নাসিব (দুর্ভাগা)। যে নিজের বাবা মাকে পেল বা দুজনের মধ্যে একজনকে (জীবিত) পেল, আর তার সাথে ভালো আচরণ করল না। সেও বদ নসিব। এবং যার কাছে আমার আলোচনা হল অতঃপর সে আমার উপর দরুদ পাঠ করল না, সেও বদ নসিব।৬

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রোজার মৌলিক এটাই শর্ত যে, জেনে বুঝে খাওয়া, পান করা এবং সহবাস থেকে বিরত থাকা। তবে তার অভ্যন্তরীণ কিছু আদব রয়েছে, যেটা অবশ্যই আমাদের জানা জরুরী(প্রয়োজনীয়)। যেন বাস্তবে রোজার বরকত অর্জিত হয়?।

অতএব রোজার তিনটি স্তর রয়েছে।

প্রথম স্তরঃ সাধারণ ব্যক্তির রোজা, রোজার অথ 'থেমে যাওয়া' বা 'বিরত থাকা'। অতএব শরীয়তের সংজ্ঞায় রোজা বলা হয়, সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাওয়া, পান করা ও সহবাস থেকে বিরত থাকা। আর এটাই সাধারণ ব্যক্তির রোজা।

দ্বিতীয় স্তরঃ খাওয়া পান করা ও সহবাস থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ কে গুনাহ থেকে বিরত রাখা। এটা খাস(বিশেষ) ব্যক্তিও রোজা।

তৃতীয় স্তরঃ নিজের সমস্ত কর্ম থেকে বিরত হয়ে গিয়ে শুধুমাত্র কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার দিকে মনোযোগ ও নিমিত্ত হওয়া। এটা খাস থেকেও খাস ব্যক্তিও রোজা।

অতএব হে প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রোজা থাকা অবস্থায় নিজের শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এবাদতে মনোযোগ করিয়ে দেওয়া এবং সব ধরনের গুনাহ থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত জরুরী নচেৎ পরিপূর্ণ রোজার বরকত অর্জিত হওয়া সম্ভব হবে না।৭

হযরত সাইয়েদুনা দাতা গঞ্জ বখ্‌স রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, রোজার হক্বিকত (বাস্তবতা) হলো বিরত থাকা।আর বিরত থাকার অনেকটি শর্ত রয়েছে উদাহরণস্বরূপ মে-দাকে (পেটকে) পানাহার থেকে বিরত রাখা, চোখকে কুদৃষ্টি থেকে বিরত রাখা, কানকে গীবত শোনা থেকে, মুখকে অযথা এবং ঝগড়াটে কথা থেকে, এবং শরীরকে আল্লাহ তায়ালার হুকুমের অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখা হলো রোজা। যখন বান্দা এই সমস্তশর্ত সমূহ বজায় রাখবে তখনই সে আসলে রোজাদার হবে।৮

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দয়া করে নিজের প্রতি মেহেরবানী করুন! একবার ভেবে দেখুন রোজাদার রমজান শরীফের মাসে খাওয়া, পান করা ছেড়ে দেয় অথচ এগুলো রোজা ব্যতীত জায়েজ ছিল এবার নিজেই ভেবে দেখুন, যে বস্তুগুলি রমজান শরীফের পূর্বে হালাল (বৈধ)ছিল। সেগুলি এই রমজান মোবারকে নিষেধ করে দেওয়া হল তাহলে রমজান শরীফের প্রথমে যে বস্তুগুলি হারাম ছিল যেমন মিথ্যা, গীবত, চুগলি, বদ গুমানি (কূ- ধারণা) গালিগালাজ, সিনেমা নাটক, গান বাজনা, খারাপ দৃষ্টি, দাড়ি কামানো, বাবা মায়ের উপরে অত্যাচার করা, মানুষের মনে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি, রমজান মোবারকের মাসে কেন বা এগুলো তার (হালাল বস্তু) চাইতে বেশি নাজায়েজ ও হারাম হবে না। রোজাদার যখন হালাল বস্তু ছেড়ে দিতে পারে, তাহলে যেগুলো সর্বদায় হারাম সেগুলো কেন ছাড়বে না!

এবার বলুন যে ব্যক্তি রমজান মোবারকের হালাল বস্তু তো ছেড়ে দেয়, কিন্তু হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কর্ম কে যদি না ছাড়ে সেটা করতে থাকে, তাহলে সে কোন ধরনের রোজাদার?

মনে রাখবেন! দোজাহানের সুলতান মাহবুবে রাহমান নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফরমান রয়েছে, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করেনি, তার এ পানাহার পরিত্যাগ করার আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। ।৯

হযরত মুল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি এই হাদিসের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, কটু কথা থেকে উদ্দেশ্য প্রত্যেক অবৈধ কথোপকথন রয়েছে যেমন মিথ্যা, অপবাদ, গীবত, গালিগালাজ ও অভিশাপ ইত্যাদি যার থেকে বাঁচা অত্যন্ত জরুরী।১০

আর এক বর্ননায় ফারমানে মুস্তাফা (রাসূলুল্লাহর বাণী) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রয়েছে কেবলমাত্র খাওয়া, পান করা থেকে বিরত থাকার নাম রোজা নয়, বরং রোজা তো এটা যেখানে ফালতু ও অশ্লীল কথা (অর্থাৎ যাতে গুনাহ রয়েছে) থেকে বাঁচা যায়।(১১)(১২)

১)মুসনাদে আহমাদ হাদিস নম্বর ৭৪৫৫। ২)সুরা বাকারাহ ১৮৩। ৩)তিরমিজি শরিফ হাদিস ৭২৩। ৪)বাহারে শরীয়ত ৫)আল এহসান বেতারতিবে সাহী ইবনে হিব্বান হাদিস ৭৪৪৮। ৬)মুজামুল আওসাত হাদিস ৩৮৭১। ৭)বাহারে শরীয়ত। ৮)কাশফুল মাহজুব ৩৫৩, ৫৪। ৯)বুখারী শরীফ হাদিস ১৯০৩। ১০মিরকাতুল মাফাতিহ পৃ৪১১। ১১)আল মোস্তাদরক হাদিস১৬১১। ১২)ফাইজানে রমজান।

লাইলাতুল ক্বদর (শবে ক্বদর) এর ফজিলত

মুফতী উমর ফারুক মিসবাহী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

ফারসি ভাষায় রাতকে শাব বলা হয় আর আরবী ভাষায় রাতকে লাইলাতুন বলা হয়। সেহেতু শাবে ক্বদর ও লাইলাতুল ক্বদরের অর্থ একটি ক্বদরের রাত।

লাইলাতুল ক্বদরকে লাইলাতুল ক্বদর কেনো বলা হয?

قيل سميت بذلك لان الارض تضيق باالملائكة فيها.

ক্বদরের অনেক গুলি অর্থের মধ্যে একটি হলো সংকীর্ণতা। এই রাতে অগণিত ফেরেশতাগণ আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ হওয়ার জন্য পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে যায়। সেই কারণে এটিকে "লাইলাতুল ক্বদর" বলা হয়।

(তাফসীরে খাজিন, ৪:৩৯৫)

ان الله تعالى يقض الا قضية فى ليلة نصف شعبان و يسلمها الى اربابها فى ليلة القدر.

ক্বদরের আর এক অর্থ ভাগ্য। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ তায়ালা অর্ধশাবানের রাতে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেন এবং এই শবে ক্বদরের রাতেই আল্লাহ তায়ালা এক বছরের ভাগ্য ও ফয়সালা তাদের ওপর অর্পণ করেন। সেই কারণে' এটিকে "লাইলাতুল ক্বদর" বলা হয়।

(তাফসীরে কুরতুবী,২০:১৩০)

انما سميت بذلك لعظمها و قدرها و شرفها

ইমাম যুহরি রমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, ক্বদরের অর্থ হচ্ছে সম্মানও মর্যাদা। যেহেতুএই রাতটি সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে অন্য রাতগুলির থেকে বেশি সেই জন্য এই রাতকে লাইলাতুল ক্বদর বলা হয়।

(তাফসীরে কুরতুবি, ২০: ১৩০)

قال ابو بكر الوراق :سميت بذلك لأن من لم يكن له قدر و لا خطر يصير فى هذه الليلة اذ قدر إذا احياها.

ইমাম আবু বকর আল-ওয়ারাক ক্বদর বলার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, যার সম্মানও মর্যাদা ছিলনা সে এই রাতে ইবাদত করে সম্মানীয় ও মর্যাদাবান হয়ে যায়। তাই এই রাতকে "লাইলাতুল ক্বদর" বলা হয়।

(তাফসীরে কুরতুবি, ২০: ১৩১)

ক্বদরের রাত বরকতময় হওয়ার কারণ

ان رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم ارى اعمار الناس قبله او ماشاء لله من ذلك فكانه تقاصر اعمار امته عن ان لا يبلغوا من العمل مثل الذى بلغ غيرهم فى طول العمر فاعطاه ليلة القدر خير من الف شهر.

যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পূর্ববর্তী উম্মতের বয়স সম্পর্কে অবহিত করা হলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের বয়স তাদের থেকে কম দেখে বললেন, আমার উম্মতেরা এত কম বয়সে পূর্ববর্তী উম্মতের মত আমল কি ভাবে করতে পারবে? অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লাইলাতুল ক্বদর দেওয়া হয়েছে যে রাত হাজার মাসের থেকেও উত্তম। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক,১: ৩১৯)

হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায় যে, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির কথা মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উল্লেখ করা হয় যে আল্লাহর পথে এক হাজার মাস জিহাদ করেছিল।

فعجب رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك و تمنى ذالك لامته فقال يا رب جعلت امتى أقصر الامم الاعمارا و اقلها اعمالا فاعطاه لله تبارك و تعالىٰ ليلة القدر.

তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতে বিস্ময় প্রকাশ করলেন এবং তাঁর উম্মতের জন্য কামনা করতে গিয়ে যখন দোয়া করলেন যে, হে আমার রব, আমার উম্মতের লোকদের বয়স কম হওয়ার কারণে নেক আমল কমে যাবে তখন আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন এই লাইলাতুল ক্বদর দান করলেন। (তাফসীরে খাযিন, ৪:৩৯৭)

উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য

লাইলাতুল ক্বদর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের একটি বৈশিষ্ট্য মাত্র। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহ আলাইহি হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

ان لله وهب لامتى ليلة القدر لم يعطها من كان قبلهم

আল্লাহ এই পবিত্র রাতটি শুধুমাত্র আমার উম্মতকেই দান করেছেন, পূর্ববর্তী উম্মতদের এই বরকতময় রাত দেওয়া হয়নি। (তাফসীরে দুররে মনসুর, ৬:৩৭১)

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ আমার উম্মতকে শবে ক্বদর দান করেছেন,তোমাদের পূর্বে কোন উম্মতকে এ রাত দান করেননি। (ফিরদৌস বি-মাসুরিল খিতাব, খন্ড:১ পৃ. ১৭৩ হাদিস ৬৪৭)

রমযানের কোন তারিখের রাত লাইলাতুল ক্বদরের রাত

রমযানের ২৭ তম রাত হচ্ছে কদরের রাত। ইমাম কুরতুবী রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেনঃ

قد اختلف العلماء فى ذالك والذى عليه المعظم انها ليلة سبع و عشرين

ক্বদরের রাত নির্ধারণের ব্যাপারে আলেমদের মতভেদ আছে, তবে অধিকাংশের অভিমত হলো লাইলাতুল ক্বদরের রাত হচ্ছে রমযান মাসের ২৭ তম রাত।

(তাফসিরে কুরতুবি ২০: ১৩৪)

এছাড়া ও দ্বীন ইসলামের অধিকাংশ উলেমায়ে কিরামগন ২৭ শে রমজানের রাতকে লাইলাতুল কদও বলে উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা আলুসী রহমতুল্লাহ আলাইহি লিখেছেন:

و كثير منهم ذهب الى انها الليلة السابعة من تلك الاوتار

অধিকাংশ আলেমদের অভিমত হল, এটি বিজোড় রাতের সাতাশতম রাত। (রুহুল মাআনী ৩০: ২২০)

সাহাবিয়ে রসূল হজরত উবাই বিন কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিকট রমযানের ২৭ তম রাত হলো শবে ক্বদরের রাত। (মুসলিম শরীফ, নম্বও: ৭৬২)

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্বদরের ২৭ তম রাতকে আখ্যায়িত করার সময় তিনটি যুক্তি বর্ণনা করতেন। যা ইমাম রাজী তাঁর নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

انه قال ليلة القدر تسعة حروف وهو مذكور ثلاث مرات فتكون السابعة والعشرين.

(১) লাইলাতুল কদর (ليلة القد) শব্দে ৯টি অক্ষর রয়েছে এবং এই শব্দটি সূরা ক্বদরে তিনবার উল্লেখ করা হয়েছে,তো ৯টি অক্ষর যুক্ত শব্দ যদি তিনবার হয় তাহলে মোট ২৭টি অক্ষর হবে। (তাফসীরে কবির ২৩:৩০)

ان السورة ثلاثون كلمة و قوله (هى) هى السابعة و عشرون فيها.

(২) সূরা ক্বদরে মোট ৩০টি শব্দ রয়েছে, যার মাধ্যমে ক্বদরের রাত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, তবে এই সূরায় যে শব্দটি দিয়ে এই রাতটির দিকে ইশারা করা হয়েছে তা হল বিশেষ্য (هى হিয়া) এর মাধ্যমে এবং এই শব্দটি হল ২৭ তম শব্দ।

ان السورة ثلاثون كلمة و قوله (هى) هى السابعة و عشرون فيها.

সূরা ক্বদরের মোট শব্দ ত্রিশটি (এবং এর মধ্যে)হিয়া শব্দটি সাতাশতম শব্দ।

(তাফসীর কবীর' ৩২:৩০, তাফসীরে কুরতুবি' ১০: ১৩৬)

(৩)সায়্যিদুনা ফারুক আযম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ক্বদরের রাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন তো উত্তরে তিনি বললেন:

احب الاعداد الى لله تعالى الوتر واحب الوتر اليه السبعة فذكر السموت السبع والارضين السبع والاسبوع و عدد الطواف.

আল্লাহ বিজোড় সংখ্যা পছন্দ করেন এবং বিজোড় সংখ্যার মধ্যেও সাত সংখ্যাটি পছন্দ করেন, কারণ আল্লাহ তাঁর কায়েনাত মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে সাত সংখ্যাটি তুলে ধরেছেন, যেমন, সাত আসমান, সাত জমিন, সপ্তাহের দিন সাত,তাওয়াফ এর চক্র সাত ইত্যাদি।

(তাফসীরে কবীর ৩২:৩০)

শবে ক্বদরের ফজিলত: কুরাআন ও হাদিসের আলোকে

পবিত্র কোরআনেপুরো একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে শবে কদরের রাত সম্পর্কে।

বঙ্গানুবাদ কাঞ্জুল ঈমান: নিশ্চয় আমি সেটা ক্বদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি, এবং আপনি কি জানেন ক্বদর রাত্রি কি? ক্বদরের রাত হাজার মাস থেকে উত্তম। এতে ফিরিশ্তাগণ ও জিবরাঈল অবতীর্ণ হয়ে থাকে স্বীয় রবের আদেশে প্রত্যেক কাজের জন্য। ওটা - শান্তি- ভোর উদয় হওয়া পর্যন্ত।

এই সূরা থেকে জানা যায় যে, শবে কদর একটি বরকতময় ও মহিমান্বিত রাত।

যা হাজার মাসের থেকে উত্তম।

*এই রাতে লওহে মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানে পবিত্র কোরআন নাজিল হয়।

*এই রাতে ফেরেশতা ও জিব্রাইল আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে অবতরণ করেন।

*এই রাতে রহমত ও বরকত নাযিল হয় ভোর হওয়া পর্যন্ত।

হাদীস: সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

হাদীস: সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ من قام ليلة القدر ايماناً و احتساباً غفرله ما تقدم من ذنبه.

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় ক্বদরের রাতে ইবাদত করবে, তাঁর পূর্বের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

(বুখারী শরীফ,১,২৭০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণীতে যেখানে লাইলাতুল ক্বদরের ইবাদত ও আনুগত্যের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে এটাও নির্দেশ করা হয়েছে যে, ইবাদত কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করতে হবে তবেই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে অন্যথায় নয়।

হাদীস: হজরত সায়্যিদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার রমজানের আগমনে বললেন:

ان هذا الشهر قد حضركم و فيه ليلة خير من الف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا حرم الخير

তোমাদের উপর যে মাসটি এসেছে তাতে এমন একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। যে ব্যক্তি এই রাত হতে বঞ্চিত থাকলো সে যেন সমস্ত কল্যাণ হতে বঞ্চিত থাকলো আর এই রাতের কল্যাণ হতে সে বঞ্চিত থাকবে যে সত্যিই কল্যান হতে বঞ্চিত।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নম্বও: ১৬৪৪)

যে ব্যক্তি অবহেলার কারণে এত বড় নেয়ামত থেকে দূরে থাকলো তার চেয়ে বঞ্চিত ব্যক্তি কে হতে পারে?

হাদীস: হজরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, লাইলাতুল ক্বদরের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

اذا كان ليلة القدر نزل جبرائيل عليه السلام فى كبكة من الملئكة يصلون على كل عبد قائم او قاعد يذكر لله عزوجل

ক্বদরের রাতে, হজরত জিব্রাইল আমিন আলাইহিস সালাম ফেরেশতাদের একটি দলে পৃথিবীতে নেমে আসেন এবং যারা দাঁড়িয়ে বা বসে (অর্থাৎ যে কোনও অবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

(শুয়াবুল ঈমান ৩:৩৪৩)

হাদীস: অন্য রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, হজরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম এবং ফিরিশতারা এ রাতে ইবাদতকারীদের সঙ্গে মুসাফাহ করেন এবং ভোর পর্যন্ত তাদের প্রার্থনায় আমীন বলেন।

(ফজাইলুল আওকাত লিল-বাইহাকী, খন্ড ৩,পৃষ্ঠা: ৩৪৩)

পতাকা নিয়ে ফিরিশতারা অবতরণ করেন

হাদীস:-হজরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন ক্বদরের রাত আসে তখন আল্লাহর নির্দেশে হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম ফেরেশতাদের একটি বিশাল বাহিনীর সাথে সবুজ পতাকা নিয়ে পৃথিবীতে আসেন এবং কাবা শরীফের উপর পতাকা উত্তোলন করে দেন। হযরত জিব্রাইলের ১০০টি ডানা রয়েছে, যার মধ্যে তিনি দুটি ডানা ঐ রাতে খোলেন সেই বাহুগুলি পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তার হয়ে পড়ে, তখন হজরত জিবরাইল আমীন নির্দেশ দেন। ফিরিশতাগণ! যদি কোন মুসলমান এ রাতে জেগে ইবাদত, নামাজ, আল্লাহর যিকর করে থাকে, তাকে সালাম দেবে এবং তাঁর সঙ্গে মুসাফাহা করবে, তাঁর প্রার্থনায় আমিন বলবে, ভোরে হজরত জিবরাইল আমীন ফিরিশতাদেরকে(আসমানে) ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ফিরিশতারা জিজ্ঞেস করেন, হে জিবরাইল আলাইহিস সালাম, আল্লাহ আপন প্রিয় হাবীবের উম্মতের মুমিনদের প্রার্থনা বা প্রয়োজনের ব্যাপারে কি করেছেন? হজরত জিবরাইল বলেন, আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাঁদের প্রতি বিশেষ ভালোবাসার দৃষ্টিপাত করেছেন এবং ৪ প্রকারের ব্যক্তি ব্যতীত অন্য সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ ৪ প্রকারের লোক কোন ধরনের হয় তিনি বললেনঃ

(১) মদ্যপানে আসক্ত ব্যক্তি

(২) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান

(৩) আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী (শরীয়তী কারণ ছাড়া) এবং (৪) যে বিদ্বেষ হিংসা করে।

(শুয়াবুল ঈমান, হাদীস নম্বর : ৩৬৯৫)

শবে ক্বদরের আমল

(১) হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেসা করেছিলাম, ক্বদরের রাতে কী ওয়াযীফা পড়া উচিত? তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শব্দগুলিকে পড়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন:

اللهم انك عفو تحب العفو فا عف عنى

বাংলা উচ্চারণ:- আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুয়্যুন তুহিববুল আফওয়া ফা'ফু আন্নি।

অর্থাৎ:-হে আল্লাহ, তুমিক্ষমাশীল এবং ক্ষমাকেই পছন্দ করো, তাই আমাকেও ক্ষমা করো।

(মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল ৬:১৭১-১৮২)

(২) নফল নামাজের থেকে উত্তম যদি অতীত জীবনের কোন কাজা নামাজ বাকি থাকে সেগুলি পড়বেন।
(৩) পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত করবেন।
(৪) দরুদ শরীফ পাঠ করবেন।
(৫) যিকির করবেন
(৫) আলেমদের কাছে বসে কিছু শেখার সুযোগ হলে শিখবেন।
(৬) বেশি বেশি করে আস্তাগফিরুল্লাহ রব্বি..... পড়বেন।
(৭) দ্বীনের আলেম এঁর জিয়ারত করবেন।
(৮) গরীব মিসকীনদেরকে সাহায্য করবেন।
(৯) সালাতুস তাসবীহ (নামাজ) পড়ার চেষ্টা করবেন।
(১০) অন্তর থেকে ঐ রাতে তওবা করার চেষ্টা করবেন।
(১১) যদি সামর্থ থাকে তো কিছু দান খয়রাত করার চেষ্টা করবেন।

শেখ সাদি রহমাতুল্লাহি আলাইহি

১. অজ্ঞের পক্ষে নীরবতাই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম পন্থা। এটা যদি সবাই জানত তাহলে কেউ অজ্ঞ হত না।

২. অকৃতজ্ঞ মানুষের চেয়ে কৃতজ্ঞ কুকুর শ্রেয়।

৩. আমি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় পাই, তার পরেই ভয় পাই সেই মানুষকে যে আল্লাহকে মোটেই ভয় পায় না।

৪. এমনভাবে জীবনযাপন করে যেন কখনো মরতে হবে না, আবার এমনভাবে মরে যায় যেন কখনো বেচেই ছিল না।

৫. হিংস্র বাঘের উপর দয়া করা নীরিহ হরিনের উপর জুলুম করার নামান্তর।

৬. যে সৎ, নিন্দা তার কোন অনিষ্ট করতে পারে না।

৭. প্রতাপশালী লোককে সবাই ভয় পায় কিন্তু শ্রদ্ধা করে না।

৮. দেয়ালের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় সতর্ক হয়ে কথা বলো, কারন তুমি জান না দেয়ালের পেছনে কে কান পেতে দাঁড়িয়ে আছে।

৯. মুখের কথা হচ্ছে থুথুর মত, যা একবার মুখ থেকে ফেলে দিলে আর ভিতরে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই কথা বলার সময় খুব চিন্তা করে বলা উচিত।

১০. মন্দ লোকের সঙ্গে যার উঠা বসা, সে কখনো কল্যানের মুখ দেখবে না।

১১. বাঘ না খেয়ে মরলেও কুকুরের মতো উচ্ছিষ্ট মুখে তুলে না।

১২. ইহ- পরকালে যাহা আবশ্যক তাহা যৌবনে সংগ্রহ করিও।

১৩. কোন কাজেই প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস করিও না।

১৪. যে মিথ্যায় মঙ্গল নিহিত তাহা অসৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত সত্য অপেক্ষা

১৫.আগন্তুকের কোনো বন্ধু নেই, আরেকজন আগন্তুক ছাড়া

১৬. অযোগ্য লোককে দায়িত্ব দেওয়া চরম দায়িত্ব হীনতা।
১৭. না শিখিয়া ওস্তাদি করিও না।
১৮. পথের সম্বল অন্যের হাতে রাখিও না।

যাকাতের বিবরণ

লেখক-মওলানা মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন মিসবাহী
শিক্ষক সুলতানপুর ও মালিপুর সুন্নী মদ্রাসা
ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ

প্রথম পর্ব

আপনারা সকলেই জানেন যে আমাদের ইসলাম ধর্মে পাঁচটি স্তম্ভ রয়েছেঃ (১) ঈমান (২) নামায (৩) যাকাত (৪) হজ্ব (৫) রোযা।

রসূলে আকরাম স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন

بُنِيَ الإِسْلاَمُ على خَمْسٍ :شَهادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وإِقامِ الصَّلاةِ، وإِيتاءِ الزَّكاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضانَ

অনুবাদ-ইসলাম ধর্মের ভিত স্থাপন করা হয়েছে পাঁচটি জিনিসের উপর যথা (১) সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই আর হযরত মুহাম্মদ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল, (২) নামায কায়েম করা, (৩) যাকাত প্রদান করা,(৪) হজ্ব পালন করা,(৫) রমযান মাসে রোযা রাখা।

এই পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে প্রত্যেকটিরই গুরুত্ব অপরিসীম। প্রত্যেকটিই আমাদের উপর ফরয কিন্তু বর্তমান সময়ে ঈমান ও যাকাতের প্রতি যতটা অবহেলা পরিলক্ষিত হয় ততটা অন্য বিষয়ে দেখা যায় না। এখন আমি যে বিষয়ের উপর আলোকপাত করবো সেটি হচ্ছে যাকাত।

যাকাতের গুরুত্ব কতটা এটা থেকে বোঝা যায় যে, মহান রব্বুল আলামীন পবিত্র ক্বোরআন মাজীদে ৩২ জায়গায় নামাযের সঙ্গে যাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন

(রদ্দুল মুহতার ৩/১৭০)

এই বিষয়টি কয়েকটি পর্বে আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরা হবে ইন শা আল্লাহ যাতে এই বিষয়টির গুরুত্ব ও বিধান পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়।

আল ক্বোরআনের আলোকে যাকাত

১। وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

(সূরা বাক্বারা আয়াত নং ৪৩)

অনুবাদঃ তোমরা নামায কায়েম রাখো এবং যাকাত প্রদান করো।

২। خُذْ مِنْ أَمْوٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

(সূরা তাওবা আয়াত নং ১০৩)

অনুবাদঃ (হে মাহবুব!) তাদের সম্পদ থেকে যাকাত সংগ্রহ করুন, যা দ্বারা আপনি তাদের কে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করবেন।

৩। مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوٰلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وٰسِعٌ عَلِيمٌ

(সূরা বাক্বারা আয়াত নং ২৬১)

অনুবাদঃ যারা নিজ সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা সেই শস্য-বীজের ন্যায় যা সাতটি করে শীষ উৎপাদন করে। প্রত্যেক শীষে একশত করে শস্যকণা এবং আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন তা থেকেও অধিক বৃদ্ধি করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, জ্ঞানময়।

৪। وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

(সূরা তাওবা আয়াত নং ৩৪-৩৫)

অনুবাদঃ এবং যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করে রাখে আর সেগুলো আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা, তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দিন,

ঐ দিন যেদিন জাহান্নামের আগুনের মধ্যে তা উত্তপ্ত করা হবে। অতঃপর তাদের ললাটসমূহে এবং তাদের পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে তা দ্বারা দাগ দেওয়া হবে।(তাদেরকে বলা হবে) এটা হচ্ছে তারই পরিণাম যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে, এখন উক্ত সম্পদের স্বাদগ্রহণ করো।

৫। وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلِلّٰهِ مِيرٰثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

(সূরা আল ইমরান আয়াত নং ১৮০)

অনুবাদঃ এবং যারা ঐ জিনিষে মধ্যে কার্পণ্য করে, যা আল্লাহ তাদেরকে আপন করুণায় দান করেছেন তারা যেন কখনো সেটাকে নিজেদের জন্য মঙ্গলজনক না ভাবে; বরং তাদের জন্য সেটা অমঙ্গলজনক। তারা যেসব সম্পদে কার্পণ্য করেছে, অদূর ভবিষ্যতে কিয়ামতের দিন সেগুলোকে তাদের গলার শৃঙখল করে দেওয়া হবে এবং আল্লাহ্ই আসমান যমীনের সত্ত্বাধিকারী আর আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত।

হাদীস শরীফের আলোকে যাকাত

১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত রসূলে করীম স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হযরত ময়াযকে (গভর্নর হিসাবে) ইয়ামান দেশে প্রেরণ করলেন, তখন বললেন, তাদেরকে তুমি এই বিষয়ের প্রতি সাক্ষ্য দেওয়ার দিকে আহ্বান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই আর আমি (মুহাম্মদ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রসূল। যদি তারা একথা স্বীকার করে নেয়, তবে তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করেছেন। যদি তারা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে শিক্ষা দিবে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের মধ্যে ধনীদের কাছ থেকে নিয়ে দরিদ্রদেও কে দেওয়া হবে

(সহীহ বুখারী হাদীস নং ১৩৯৫)

২। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রসূলে আযম স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পর যখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু আনহু খলীফা হিসাবে নিযুক্ত হলেন, তখন বেদুইনদের মধ্যে কিছু লোক কাফির হয়ে গেল(কেননা তারা যাকাতকে অস্বীকার করে দিয়েছিল)। সিদ্দিক্বে আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সঙ্গে জিহাদ করার আদেশ দিলেন।

এই আদেশ শুনে হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন আপনি তাদের সঙ্গে কিভাবে যুদ্ধ করতে পারেন? কেননা রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো বলেছেন যে, আমাকে মানুষের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" না বলবে। আর যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু"বলে নিলো, সে নিজের প্রাণ ও ধন-সম্পদ সুরক্ষিত করে নিলো। তবে ইসলাম যেটার নির্দেশ দিয়েছে, তার হিসাব আল্লাহ তাআলা করবেন।(অর্থাৎ এরা তো কালেমা পড়ে এদের সঙ্গে কিভাবে জিহাদ করা যেতে পারে?)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, খোদার কসম! আমি তাদের সঙ্গে অবশ্যই জিহাদ করবো, যারা নামাজ এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে। যাকাত ধন সম্পদের উপর আরোপিত হক। রসূলে কারীম স্বল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে তারা যে ছাগলের বাচ্চা দিয়ে পাঠাতো যদি আমাকে দিতে অস্বীকার করে তাহলেও আমি তাদের সঙ্গে জিহাদ করবো।

হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন খোদার কসম! আমি অনুভব করলাম যে আল্লাহ তা'আলা হযরত সিদ্দীক্বে আকবরের বক্ষ বিস্তৃত করে দিয়েছেন। সে সময় আমিও জানতে পারলাম যে, ওটাই সঠিক

(সহীহ বুখারী হাদীস নং ১৩৯৯,১৪০০)

৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত রাসূলে খোদা স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন পাঁচটি জিনিস পাঁচটি জিনিসের পরিণাম।

জিজ্ঞাসা করা হলো,ইয়া রসূলাল্লাহ এই কথার তাৎপর্য বুঝতে পারলাম না। হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন

(১) যখন কোন সম্প্রদায় ওয়াদা ভঙ্গ করে তখন তাদের ওপর তাদের শত্রুকে কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয়।

(২) যখন তারা খোদা প্রদত্ত বিধান উপেক্ষা করে বিচার করে, তখন তাদের মধ্যে দারিদ্রতা বৃদ্ধি পায়।

৩/ যখন তাদের মধ্যে অশ্লীলতা দেখা দেয়, তখন তাদের মধ্যে মৃত্যু ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়।

৪/ যখন তারা যাকাত দেওয়া বন্ধ করে দেয়, তখন তাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষনও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

৫/ যখন তারা পরিমাপে কারচুপি করে, তখন তাদের শস্যের উৎপাদনও বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং তাদেরকে দূর্ভিক্ষে পতিত করে দেওয়া হয়।

(আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব হাদীস নং-১১১১)

(চলবে).....

রমযান মাসে ওমরাহ পালনের ফজিলত

মুফতী আলামীন মিসবাহী, পাকুড়, ঝাড়খন্ড

সাধারণত এবাদত দুই প্রকার, একটি শারীরিক যেমন নামাজ আদায় করা, আর একটি আর্থিক যেমন আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করা। ওমরাহ এমন একটি ইবাদত যা আমাদের জন্য আর্থিক ও শারীরিক উভয় ইবাদাতে সমৃদ্ধ। ওমরাহ পালনের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই, হজ্জের দিনগুলোতে অর্থাৎ ৯ যুল-হিজ্জা থেকে ১৩ই যুল- হিজ্জা পর্যন্ত ওমরাহ করা মাকরূহ। এই পাঁচটি দিন ব্যতীত বছরের যে কোন দিন, যতবার ইচ্ছা ওমরাহ করা যেতে পারে। তবে রমজান মাসে ওমরাহ পালনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আমাদের হানাফী মতে জীবনে একবার ওমরাহ পালন করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

(রদ্দুল মুহতার, হজের অধ্যায়, আহকামে ওমরাহ পরিচ্ছেদ, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা নম্বর: ৪৭৫)

নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ ও ওমরাহ:

নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি হজ পালন করেছেন; দুটি হিজরতের পূর্বে আর একটি হিজরতের পরে। যথাঃ হাদিস শরীফ:

عن جابر بن عبد الله ان النبى صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج :حجتين قبل ان يهاجر وحجة بعد ما هاجر ومعها عمرة

(তিরমিযী শরীফ, হজ্জের বয়ান,হাদিস নম্বর ৮১৫)

অর্থাৎ:- হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি হজ পালন করেছেন: দুটি হিজরতের পূর্বে আর একটি হিজরতের পরে।

নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারটি ওমরাহ পালন করেছেন:

যথাঃ হাদীস শরীফ:

عن ابن عباس رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر: عمرة الحديبية وعمرة الثانية من قابل وعمرة القضاء فى ذى القعدة وعمرة الثالثة من الجعرانة والرابعة التى مع حجته

(তিরমিযী শরীফ,হজের বয়ান, হাদীস নম্বর ৮১৬)

বঙ্গানুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি ওমরাহ করেছেন: এক হুদাইবিয়ার ওমরাহ দ্বিতীয় পরের বৎসর যিল-কা'দাহ মাসে কাযা ওমরাহ তৃতীয় ওমরাহ জি'ইর্রানা থেকে চতুর্থ আমরা যা তিনি হজ্জের সাথে করেছিলেন।

মহানবী স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বারংবার ওমরাহ পালনের জন্য উৎসাহিত করেছেন।

যথাঃ হাদীস শরীফ:

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة

(বুখারী শরীফ, ওমরাহের অধ্যায়, ওমরাহের ফযীলত এর পরিচ্ছেদ, হাদীস নম্বর: ১৬৮৩)

হযরত আবু হুরায়রাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, নবী পাক স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এক ওমরা থেকে অপর ওমরা তার মধ্যকার গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়। আর মকবূল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া কিছুই নয়(অর্থাৎ মকবূল হজ্জকারী হবে জান্নাতী)

হাদিস শরীফ:

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر لهم

(সুনানে ইবনে মাজাহ, আল-মানাসিক নামক অধ্যায়, হজ্জের দো'য়ার ফযীলতের পরিচ্ছেদ, হাদীস নম্বর: ২৮৯২)

অনুবাদঃ হযরত আবু হুরায়রাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারী আল্লাহর মেহমান, তারা তাঁর কাছে দোয়া চাইলে তিনি কবুল করেন আর মাগফিরাত কামনা করলে তিনি তাদের ক্ষমা করেন।

রমজান মাসে ওমরা পালনের ফযীলতঃ

হাদীস পাকঃ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিতঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الانصار ما منعك ان تحجي معنا؟ قالت :لم يكن لنا الا ناضحان فحج ابو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه، قال :فاذا جاء رمضان فاعتمري .فان عمرة فيه تعدل حجة (ولفظ مسلم)

(বুখারী শরীফ, হাদিস নম্বর ১৭৮২-মুসলিম শরীফ হজের অধ্যায় রমজান মাসে ওমরাহ পালনের ফজিলতের পরিচ্ছেদ, হাদিস নম্বর ১২৫৬)

বঙ্গানুবাদঃ রাসূলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারী মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের সাথে হজ করতে তোমার জন্য বাধা কী? সে উত্তরে বললেন, আমাদের কাছে কেবলমাত্র দুটি উট আছে, একটিতে আমার ছেলে ও তার পিতা হজ্জ করতে গিয়েছেন আর অন্যটি আমাদের জন্য রেখেছেন যাতে আমরা জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য এটি ব্যবহার করতে পারি। নবী পাক স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন রমজান মাসের আগমন ঘটবে তখন ওমরাহ করে নেবে কারণ রমজান মাসের ওমরাহ হজ্জের সমতুল্য।

হাদীস পাকঃ

নবী পাক স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

فعمرة فى رمضان تقضى حجة او حجة معى

(মুসলিম শরীফ, হজের অধ্যায়, রমজান মাসে ওমরাহ পালনের ফযীলতের পরিচ্ছেদ)

বঙ্গানুবাদঃ রমজান মাসে ওমরাহ হজের সমতুল্য অথবা আমার সঙ্গে হজ করার সমতুল্য। হাদীস পাকঃ নবী পাক স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ما يعدل حجة معك কোন এমন কাজ যা আপনার সাথে হজ করার সমতুল্য হবে? নবী পাক উত্তরে বললেন انها تعدل حجة معى يعنى عمرة فى رمضان -রমজান মাসে ওমরাহ পালন করা আমার সাথে হজ করার সমতুল্য।

(আবু দাউদ শরীফ, আল-মানাসিক নামক অধ্যায়, ওমরাহের পরিচ্ছেদ, হাদিস নম্বর ১৯৯০)

সংক্ষিপ্ত আকারে ওমরাহের কার্যাবলী:

১/ হেল্ অথবা মীক্বাত থেকে ওমরাহের ইহরাম বাঁধা।
২/ কাবা শরীফের তাওয়াফ করা।
৩/ সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সায়ী করা অর্থাৎ দৌড়ানো। ৪/ এবং মাথা নেড়া করা অর্থাৎ কেশ কাটিয়ে দেওয়া। আল্লাহপাক যেন আমাদের সকলকেই হজ ও ওমরাহ করার তৌফিক দান করেন, এবং দয়ার নবীর মদিনা দেখার সুযোগ দান করেন!

بجاه سيد المرسلين

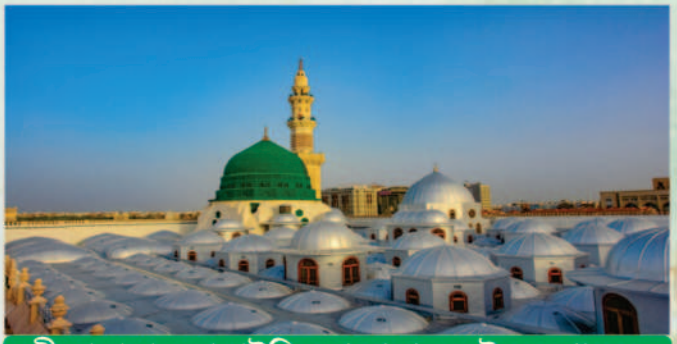

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইলমে গায়েব

عن عمر قَامَ فِينَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَقَامًا، فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ، وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ.

অনুবাদঃ- হযরত 'উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মধ্যে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি সৃষ্টির আদি হতে জান্নাতীদের জান্নাত প্রবেশ এবং জাহান্নামিদের জাহান্নামের প্রবেশ হওয়া পর্যন্ত সমগ্র বিষয়ের বিশদ বিবরণ আমাদের দিলেন। যে ব্যক্তি এ কথাটি স্মরণ রাখতে পেরেছে, সে স্মরণ রেখেছে আর যে ভুলে যাবার সে ভুলে গেছে।

(সহিহ বুখারী,প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৫৩, হাদীসঃ ৩১৯২)
হাদিসের মানঃ সহীহ

১৭ ই রমাদ্বান ইসলামী ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন

মুফতি শামসুদ্দোহা মিসবাহী, ফলতা, দঃ২৪পরগনা, পঃবঃ

১৭ই রমাদান ইসলামের ইতিহাসে স্মরণীয় একটি দিন এই দিনে মুসলমান ও কোরাইশ কাফেরদের মধ্যে প্রথম ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে হিজরি দ্বিতীয় বর্ষে রমাদ্বানের ১৭ তারিখে সংঘটিত হয়েছিল ঐতিহাসিক এই বদরের যুদ্ধ। ইসলামী ইতিহাসে তা গাজওয়ায়ে বদর ও পবিত্র কোরআনে তাকে ইয়াওমুল ফুরক্বান অর্থাৎ মীমাংসার দিন (পার্থককারী দিন) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআন মাজীদের সূরা ইমরান ও সূরা আনফালের মধ্যে বদর যুদ্ধের বর্ণনা এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন "হে মাহবুব! যখন আল্লাহ আপনাকে আপনার স্বপ্নে কাফেরদেরকে সংখ্যায় স্বল্প দেখিয়েছিলেন এবং হে মুসলমানগন! যদি তিনি তোমাদেরকে তাদের সংখ্যায় অধিক করে দেখাতেন তবে অবশ্যই তোমরা সাহস হারাতে এবং যুদ্ধ বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে কিন্তু আল্লাহ রক্ষা করেছেন নিশ্চয়ই তিনি অন্তর সমূহের কথা জানেন

(সূরা আনফাল-আয়াত ৪৩)

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৬২২ খ্রিস্টাব্দে আল্লাহর নির্দেশে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন যার ফলে ইসলাম ও মুসলমানদের জীবনে এক নব অধ্যায়ের সূচনা হয় এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ দ্রুত বেগে চলতে থাকে ফলে দুই বছরের অল্প সময়ের মধ্যে মদিনার চারিদিকে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে পড়ে অপরদিকে মুসলমান ও ইসলামকে সমূলে বিনাশ করার অপচেষ্টা ও বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও কু পরিকল্পনার সাথে সাথে মুসলমানদের উপর অন্যায় ও অত্যাচার অধিক হারে করতে থাকে এ সমস্ত বিষয়াদি কে সম্মুখে রেখে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩১৩ জন আনসার ও মুহাজীর সাহাবাদের নিয়ে আবু সুফিয়ানের (তখন তিনি ঈমান আনেন নি) নেতৃত্বে বাণিজ্য কাফেলার পথ অবরোধের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন অপরদিকে আবু সুফিয়ান উক্ত বিষয়টি জানতে পেরে আবু জাহেলকে তাদের রক্ষার বার্তা পাঠালো ফলে আবু জাহলের নেতৃত্বে ৭০০ উষ্ঠারোহী ১০০ অশ্বারোহী ও ২০০ পদাতিক সৈন্যসহ প্রায় এক হাজার সৈন্যবাহিনী মদিনা মুখী হয়, এ সংবাদ শুনে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তিত হন তখনই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে আয়াত অবতীর্ণ করেন " এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং সীমা অতিক্রম করো না আল্লাহ পছন্দ করেনা সীমা অতিক্রম কারীদের" (সূরা বাক্বারাহ-আয়াত ১৯০)

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩১৩ জনের নিরস্ত্র ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে মদিনার দক্ষিণ-পশ্চিমে বদর নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন এবং দ্বিতীয় হিজরির ১৭ই রমাদ্বান মুসলমান ও কোরাইশ কাফেরদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। অবশেষে আল্লাহর রহমত ও ফারিস্তার রূপে তার সাহায্যের বরকতে মুসলমান নিরস্তক ক্ষুদ্র বাহিনীর সাথে জয়লাভ করেন ও কাফের কোরাইশ বাহিনী পরাজিত হয়ে পালায়ন করে। এ যুদ্ধে কোরাইশদের নেতা আবু জাহেল সহ ৭০ জন নিহত হয় এবং ৭০ জন মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়। পক্ষান্তরে ১৪ জন মুসলমান সাহাবায়ে কেরাম শাহাদাত বরণ করেন।

বদরের যুদ্ধ ছিল মুসলিম ও ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধ এ যুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজিত হলে পৃথিবী থেকে চিরতরে ইসলামের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেত যেমনটি হাদিসে উল্লেখ আছে " ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন বদরের দিন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করছি হে আল্লাহ! আপনি যদি চান (কাফেররা জয়লাভ করুক) তাহলে আপনার ইবাদত আর হবেনা।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর হাত ধরে বলেন যথেষ্ট হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত পাঠ করতে করতে বের হলেন " এখন তাড়া করা হচ্ছে এ দলকে (অর্থাৎ শীঘ্রই দুশমনরা পরাজিত হবে) এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে (সূরা ক্বামার - আয়াত ৪৫) বুখারী শরীফ হাদীস নং - ৩৯৫৩ " এবং বদর যুদ্ধের অবস্থাকে তুলে ধরে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআন শরীফে বলেন " নিশ্চয়ই আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন যখন তোমরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ছিলে

(সূরা আল ইমরান - আয়াত ১২৩)

মুসলমান সৈন্যবাহিনী সত্য পথের পথিক ও আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিলেন ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য পেয়েছেন এবং ৩১৩ জনের ক্ষুদ্র নিরস্ত্র সৈন্যবাহিনী ১০০০ অস্ত্রশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে জয় লাভ করে ইসলামে সর্বোত্তম ইতিহাস রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন সুতরাং বর্তমান অত্যাচারিত মুসলিম সমাজ নিজের প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবা বর্গদের অনুসারী হয়ে যদি আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে তাহলে তারাও একদিন অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে ইনশাআল্লাহ।

জাহান্নামের পরিচয়

১। জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য ইহার অস্বীকার কারী কাফির।
(বাহারে শারিয়াত প্রথম ভাগ পৃ: নং- ৪২)

২। উত্তাপের ক্ষেত্রে পৃথিবীর আগুন জাহান্নামের আগুনের চাইতে সত্তর গুণ কম।
(বাহারে মিশকাত প্রথম ভাগ পৃ: নং- ৪৮)

৩। হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে শপথ করে বলেন, যদি জাহান্নামের আগুন সুচের ছিদ্র পরিমান পৃথিবীতে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাহলে তার উত্তাপে সমস্ত পৃথিবীবাসি মৃত্যুবরন করবে। আরও শপথ করে বলেন যে, জাহান্নামের কোনো দ্বাররক্ষী যদি পৃথিবীবাসির প্রতি প্রকাশ হয় তাহলে তার ভয়াবহ চেহারা ও দেহ দেখে সবাই প্রাণ ত্যাগ করবে। এবং তৃতীয় শপথ নিয়ে বলেন যে, জাহান্নামের শিকলের একটি কড়া যদি পাহাড়ের উপর রাখা হয় তাহলে পাহাড় স্থীর না থাকতে পেরে কম্পন করতে আরম্ভ করবে আর অবশেষে সমতল ভূমি পর্যন্ত ধসে যাবে।
(বাহারে শারিয়াত প্রথম ভাগ পৃ: নং- ৪৯)

৪। জাহান্নামের গভীরতা এতবেশি যে, যদি পাথরকে জাহান্নামের তীরে দাড়িয়ে নিক্ষেপ করা যায়, তাহলে সত্তর বছরেও তার তলদেশ পর্যন্ত পৌছাবে না।

৫। জাহান্নামিদেরকে উত্তপ্ত তেলের তলনীর ন্যায় অত্যান্ত ফুটন্ত জল, পান করার জন্য দেওয়া হবে। পান করার জন্য মুখের নিকট নিয়ে আসা মাত্র মুখমন্ডলের খাল উত্তাপে ঝরে যাবে। মাথায় গরম জল প্রবাহিত করা হবে। জাহান্নামীদের শরীর হতে গলে যাওয়া রক্ত মাংস তাদেরকে পান করানো হবে। কাঁটাযুক্ত যাক্কুম ফল তাদেরকে খেতে দেওয়া হবে। খাওয়া মাত্র তাদের গলায় আটকে যাবে। গলা থেকে ছাড়াবার জন্য জল চাইলে ফুটন্ত জল দেওয়া হবে, যা পান করার সাথে সাথে মুখ হতে পেট পর্যন্ত সমস্ত অভ্যান্তরীন দেহ -পেশি গলে গলে পাঁ বেয়ে পড়বে।
(বাহারে শারিয়াত প্রথম ভাগ পৃ: নং-৪৯)

৬। জাহান্নামীগণ গর্দভের ন্যায় চিৎকার মেরে কাঁদবে। প্রথম প্রথম অশ্রু বের হবে, অশ্রু শেষ হলে রক্ত বের হবে। কেঁদে কেঁদে তাদের গালগুলিতে বিশাল গর্ত হয়ে যাবে। তাদের কান্নার অশ্রু জল ও রক্ত এত বেশি প্রবাহিত হবে যে, নৌকা চালালে চালানো যাবে।
(বাহারে শারিয়াত প্রথম ভাগ পৃ: নং-৫০

মুফতী আসগার আলী আলাঈ
কদমতলী, পুখুরিয়া, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ।

প্রশ্নঃ- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র যুগে ঈদের নামায় মহিলাদের সাথে নিয়ে ঈদগাহে হতো, আর আজ সেটা মাকরূহ তাহরিমী কেমন করে হলো ?

উত্তরঃ- কোন সন্দেহ নেই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র যুগে মহিলারা ঈদের নামাযের জন্য ঈদগাহে যেতেন, যা বহু হাদীস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخْرِجُ الأَبْكَارَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيدَيْنِ

হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'ঈদুল ফিতর ও 'ঈদুল আযহার দিন কুমারী, তরুণী, প্রাপ্তবয়স্কা, পর্দানশিন এবং ঋতুবতী সব মহিলাদের (নামাযের জন্য) বের হওয়ার ('ঈদের মাঠে যাওয়ার) হুকুম করতেন।

{{সহীহ বুখারী শরীফ, হাদীস নং- ৯৮০, সুনান আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং- ১১৩৬, সুনান ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং- (১৩০৭)}}

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! তবে কিছু বাস্তবতা রয়েছে যা আমাদের জানা উচিত। উদাহরণ স্বরূপঃ রামযান মাসের রোযা মদীনা শরীফে দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়েছে। বিখ্যাত মুফাসসির হযরত ইবনে জারীর ত্বাবারী রহিমাহুল্লাহর কথা অনুযায়ী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় হিজরীতে ঈদের নামায পড়িয়েছিলেন। কিন্তু মহিলাদের পর্দার হুকুমটি দুই অথবা চার হিজরীতে (মতান্তরে) নাযিল হয়েছে, তবে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফাক্বীহ ইমাম ইবনে হাজার আসক্বালানী রহিমাহুল্লাহ

(ফাতহুল বারী শারহে সহীহ বুখারী, খন্ড নং: ৭, পৃষ্ঠা নং:৫৩৭)

এক্ষেত্রে চুর্থ হিজরীকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

পর্দার মাসয়ালা প্রকাশিত না হওয়ায় প্রথম তিন বছর মহিলাদের ঈদের নামাযে যাওয়াতে কোনও সমস্যা হয়নি। এছাড়া শরীয়তের বিধিনিষেধগুলি সেসময় ধীরে ধীরে প্রকাশ হচ্ছিল এবং ফিতনার কোন প্রত্যাশা ও ছিল না,

সুতরাং প্রয়োজন ছিল যে মহিলারাও মহানবীর সাহচর্য থেকে সরাসরি উপকৃত হন এবং ধর্মীয় নির্দেশনা অর্জন করেন।

পরক্ষণে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহিলাদেরকে বাড়িতে এবং পর্দার স্থানে নামাজ পড়ার জন্য উৎসাহিত করেন এবং মহিলাদের বাড়ির নামাজকেই সব থেকে উত্তম নামাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

{{মাআ'রিফুল হাদীস, হাদীস নং: ৫৪৪}}

বিশ্ব নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মহিলাদের বাড়িতে নামায আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সে সম্পর্কে নিম্নে দুটি হাদীস উল্লেখ করা হলো।

হাদীস নং-১

আবূ হামিদ সাঈদের স্ত্রী উম্মে হামিদ থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সাথে সালাত আদায় করতে পছন্দ করি। তিনি বললেনঃ আমি জানি তুমি আমার সাথে সালাত আদায় করতে পছন্দ করো {কিন্তু} তোমার বাড়ির একরূমে নামায পড়া, তোমার বাড়িতে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম এবং তোমার জন্য তোমার বাড়িতে নামায পড়া, সম্প্রদায়ের মসজিদ হতে আরও উত্তম। এবং তোমার সম্প্রদায়ের মসজিদে নামায পড়া, আমার মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে আরও উত্তম। তিনি বললেন: আমাকে একটি ঘরের শেষ কোণে অন্ধকার মসজিদ (নামাযের জায়গা) নির্মাণের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহর কসম! আমি মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই নামায আদায় করছিলাম।

{{সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস নং- ১৬৮৯, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-২২১৭, মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং- ২৭০৯০}}

হাদীস নং-২

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

হযরত ইবনে 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের নারীদের মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। তবে তাদের ঘরই তাদের জন্য অতিউত্তম।

{{সুনান আবু দাউদ শরীফ, হাদিস নং - ৫৬৭}}

সম্মানিয় পাঠকবৃন্দ! ইহা হতে সুস্পষ্ট হয় যে, নামাযের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য সবথেকে সুরক্ষিত ও উওম (PARFECT) জায়গা তার বাড়ির নির্জন স্থান।

হযরত উম্মুল-মু'মিনীন আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা যার দ্বারা ইসলামী আইনের(নিয়মাবলী)মূল্যবান অংশ মুসলিম উম্মাহর কাছে পৌঁছেছে, তিনি বিশ্ব নাবীর প্রকাশ্য জীবদ্দশা থেকে পর্দা নেওয়ার পর প্রায় ৪৮ বছর জীবদ্দশায় ছিলেন।

তিনি নারীদের তৎকালীন পরিস্থিতিকে সামনে রেখে মসজিদে তাদের নামাজ আদায় সম্পর্কে বলেছিলেন:

لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

অর্থাৎ: যেই মাত্রায় সমাজে পরিবর্তন এসেছে বিশ্ব নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি জীবিত (দুনিয়ায়) থাকতেন তবে তাদের (মসজিদ হতে) তদ্রূপ নিষিদ্ধ করে দিতেন যেমন বনী ইস্রায়েলের মহিলাদের নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।"

{{রেফারেন্স: সহীহ আল-বুখারী শরীফ, হাদীস নং- ৮৬৯, সুনান আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং -৫৬৯, সহীহ মুসলিম শরীফ, হাদীস নং- ১৪৪, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস নং- ১৬৯৮, মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক্ব, হাদীস নং- ৫১১৩, মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং- ২৫৬১০}}

ইমাম তিরমিজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ব্যাখ্যা অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফাক্বীহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ও হযরত সুফিয়ান সাওরী রাহিমাহুমাল্লাহ নিজ নিজ যুগের পরিস্থিতি অনুযায়ী মহিলাদের মসজিদে যাওয়াকে মাকরূহ বলেছেন।

এছাড়াও প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সুফিয়ান সাওরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকেও নকল করা হয়েছে যে, তিনি বলেন- মহিলাদের ঈদের নামাযের জন্য বাড়ি থেকে বের হওয়া নিষিদ্ধ।

{{ তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং: ৫৪০}}

তদ্রূপ ঈমামুল আইম্মাহ ফিল-হাদীস ও ফিক্বাহ হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ এবং তাঁর অনুসারী প্রসিদ্ধ ইমাম গণের মতানুযায়ী মহিলাদের মসজিদে যাওয়া এবং জামাতে অংশগ্রহণ করে নামাজ আদায় করা হলো মাকরূহ।

ইমাম ত্বাহাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বিশ্ব নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র যুগে মহিলাদের ঈদগাহ যাওয়ার কারণ উল্লেখ করেছেন যে প্রথমে পবিত্র ইসলাম ধর্মে মুসলমানদের জনসংখ্যা অনেক কম ছিল তাই মহিলাদেরকে মসজিদ ও ঈদগাহ মাঠে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল যাহাতে মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং কাফেররা তাদের দেখে ভয় পায়?।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারী রহিমাহুল্লাহ বলেন-যে, বর্তমান যুগে এটারো কোন প্রয়োজন নেই তাই বর্তমান পরিস্থিতি ও মহিলাদের চলাফেরা কে লক্ষ্য করে ভরসাযোগ্য উলামায়ে কেরামগণ বলেছেন-মহিলাদের মসজিদ ও ঈদগাহ মাঠে গিয়ে জামাতে অংশগ্রহণ করা হলো মাকরূহে তাহরিমী। (মিশকাত শরীফ, হাদীস নং ১০৬০)-এর বিশ্লেষণে মিরক্বাতুল মাফাতিহ কিতাবে উল্লেখিত রয়েছে।

প্রশ্ন:-মহিলাদের ঈদগাহে গিয়ে নামায আদায় করা যখন মাকরূহ তবে কী তাঁরা একাকী বাড়ীতে নামাজ আদায় করবে?

উত্তর:-প্রথমে আমাদের জেনে রাখা দরকার যে, ঈদের নামায় হলো ওয়াজিব। যেটা বহু ফিকহ ও ফাতাওয়ার কিতাবে এবং ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম কারখী রহিমাহুমাল্লাহ থেকেও উল্লেখিত রয়েছে। এটাই হলো আমাদের মতামত কিন্তু কেউ কেউ ফারযে কিফায়া ও শুধু ফরয বলেছেন।

ফিকহের কিতাব (হিদায়ার শারাহ আল-বিনায়াহ, খন্ড নং:৩, পৃষ্ঠা নং:৯৫)এ প্রদত্ত রয়েছে "যে, ঈদের নামায় তার উপরেই ওয়াজিব রয়েছে যার উপর জুম'আ ওয়াজিব।"

আর (কানযুদ দাক্বায়িক্ব, খন্ড নং: ১, পৃষ্ঠা নং: ২২৩)-এ লিপিবদ্ধ আছে যে, জুম'আ তারই উপর ওয়াজিব হয় যার মধ্যে নিম্নের শর্ত সমূহ পাওয়া যায়"

"وَشَرْطُ وُجُوبِهَا الْإِقَامَةُ وَالذُّكُورَةُ"

অর্থাৎ:-"জুম'আ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত সেখানকার বাসিন্দা হওয়া (মুসাফিরের উপর ওয়াজিব নয়) এবং পুরুষ হওয়া (মহিলাদের উপর নয়)।"

সুতরাং এখান থেকে সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় যে, যখন জুমা' ও ঈদের শর্ত একই, আর মহিলাদের জন্য জুম'আর নামাযই নেই, তথাপিয় এটা প্রাণিত হয় যে, তাদের জন্য ঈদের নামাযও নেই।

বিঃ দ্রঃ:- তবে তারা গোসল করে নতুন পোশাক পরিধান করতে পারবে, এবং স্বামী, ছেলে, বাবা ও ভাই তাদের সাজিয়ে-গুজিয়ে(সজ্জিত করে) ঈদগাহ ময়দানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করে দেবে। অতঃপর যদি তারা চায় তাহলে বাড়িতে নফল নামায ও সময় হলে বিশেষ করে চাশতের নামায আদায় করতে পারে।

রোজা ভঙ্গের কারণ সমূহ

মাওলানা আশিকুর রহমান মিসবাহী

রোজা মহান আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে দেওয়া এমন একটি ঈবাদত,যেটির মাধ্যমে একজন মুসলমান-এর অন্তরে খোদাভীতি অর্জিত হয়।এই রোজার মাধ্যমে বান্দা অধিকহারে নেকী সঞ্চয় করে কিন্তু দুঃখজনক হলেও এটাই সত্য যে,অনেক মানুষ এই রোজাকে সঠিক ভাবে আদায় করতে সক্ষম হয়না। যার পিছনে অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ হলো-রোজা ভঙ্গের কারণসমূহ থেকে অজ্ঞতা। অনেক মানুষের মধ্যে রোজা ভঙ্গের কারণ পাওয়া যায় কিন্তু তারা মনে করে যে, আমাদের রোজা ভঙ্গ হয়নি। কেননা তারা রোজা ভঙ্গের কারণ সম্পর্কে অবগত নয়।তাই আমি অধম রোজা ভঙ্গের কারণ সমূহ কে নিম্নে তুলে ধরলাম, যাতে একজন মুসলমান সেই সমস্ত কারণগুলো সম্পর্কে অবগত হয়ে তা থেকে বিরত থেকে নিজ রোজা কে সম্পূর্ন ভাবে আদায় করতে সক্ষম হয়।

রোজা ভঙ্গের কারণ সমূহ

১/ইচ্ছাকৃত ভাবে পানাহার করলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়।

২/ ধূমপান এবং পান-জর্দা ইত্যাদি খেলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়।

৩/ রোজা অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়।

৪/ নিজের থুতু হাতের তালুতে রেখে গিলে নিলে বা অন্যের থুতু গিলে নিলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৫/ ঘুমে বিভোর ছিল এবং মুখ খোলা থাকার কারণে যদি বৃষ্টির পানি বা শিলাবৃষ্টি কণ্ঠনালির নিচে চলে যায়,তাহলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৬/ স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরার কারণে যদি বীর্যপাত হয়ে যায়, তাহলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৭/ কুল্লি করার সময় অথবা নাকে পানি দেওয়ার সময় যদি পানি কণ্ঠনালির নিচে চলে যায়,তাহলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে যদিওবা অনিচ্ছাকৃত ভাবে হয়। তবে যদি রোজা রাখার কথা স্মরণে না থাকে,তাহলে রোজা ভঙ্গ হবেনা।

৮/ দাঁতের ফাঁকে ছোলা সমপরিমাণ কোন বস্তু ছিল,সেটিকে যদি গিলে নেয়, তাহলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে।তদ্রূপ ছোলা থেকে পরিমাণে ছোট কোন বস্তু মুখে ছিল, সেটিকে যদি মুখ থেকে বার করে পুনরায় খেয়ে নেয়,তাহলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৯/ চিনি বা চিনির ন্যায় কোন এমন বস্তু যা মুখে রাখলে গলে যায়,কেউ যদি মুখে রাখে এবং ঢোক গিলে নেয় তাহলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

১০/ রোজা অবস্থায় ইনহেলার ব্যবহার করলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

১১/ রোজা অবস্থায় যদি মহিলাদের মাসিক (পিরিয়ড) আরম্ভ হয়ে যায়,তাহলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

১২/ ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভর্তি বমি করলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

১৩,/রোজা অবস্থায় হস্তমৈথুন করলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

১৪/ ধুপকাঠির ধোঁয়া ইচ্ছাকৃত ভাবে নাক দিয়ে প্রবেশ করালে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

১৫/ইফতারের সময় হওয়ার পূর্বেই ইফতার করে নিলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

১৬/ কানে তেল বা ঔষধ দিলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

১৭/ মুখে রঙিন সুতো রাখার কারণে যদি থুতু রঙিন হয়ে যায় আর সেই থুতু গিলে নেয়,তাহলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

১৮/ দুই ফোটার অধিক চোখের অশ্রু যদি মুখে পড়ে আর সেটি গিলে নেয় এবং লবনাক্ত অনুভূত করে,তাহলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

২০/ রোজা অবস্থায় দাঁত উপড়িয়ে ফেলার কারণে যদি রক্ত বেরিয়ে আসে এবং সেই রক্ত কণ্ঠনালীর নিচে চলে যায়, তাহলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে ।

২১/কোন মহিলা যদি তার ভেজা আঙ্গুল মলদ্বারে বা লজ্জাস্থানে প্রবেশ করায়,তাহলে তার রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

২২/নাক দিয়ে ঔষধ প্রবেশ করালে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

২৩/ যদি অনিচ্ছাকৃত ভাবে বমি করার সময় কিছু টা বমি কণ্ঠনালির নিচে চলে যায়, তবে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

ইসলামিক মাস গুলির মধ্যে পবিত্র রমযান মাস হলো একটি অন্যতম মাস, কেননা মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা রমযান মাসকে বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানে সম্মানিত করেছেন। কোরআন ও হাদীসের মধ্যে তার মর্যাদার ক্ষেত্রে অসংখ্য বাণী বর্ণিত হয়েছে । বহু বিশেষত্ব ও বৈশিষ্টের কারণে পবিত্র রমযান মাসের মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পায়,

রমযান মাস সিয়াম সাধনা ও পরহেযগারী অর্জন করার মাস

কোরআন পাকের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা রোযা রাখাকে অনিবার্য করার পর তার উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অনুবাদ :-হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমাদের পরহেযগারী অর্জিত হয়

(সূরা বাক্বারা : আয়াত ১৮৩)

রমযান মাস , কুরআন অবতীর্ণ ও রহমতের বার্তাবাহী মাস

রমযানের অরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো- এটি কুরআন অবতীর্ণের মাস । রমযানের এক সম্মানিত রাতে (লাইলাতুল কদওে) আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মাদির জীবন পরিচালনার জন্য গাইড হিসেবে মহাগ্রন্থ কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ করেছেন। একাধিক আয়াতে তা এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

অনুবাদ : রমযানের মাস, যাতে ক্বোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, মানুষের জন্য হিদায়ত ও পথ নির্দেশ এবং মীমাংসার সুস্পষ্ট বাণীসমূহ।

(সূরা বাক্বারা : আয়াত ১৮৫)

রমযান মাস, শয়তান দের আবদ্ধ করে রাখার মাস

প্রখ্যাত সাহাবীয়ে রসূল হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ

অনুবাদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যখন রমযান প্রারম্ভ হয়, আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় আর শৃংখলিত করে দেওয়া হয় শয়তানকে।

(মুত্তাফাক আলাই , বুখারী শরীফ , হাদীস নং - ১৮৯৯)

এ বৈশিষ্ট্যের অন্যতম ফলাফল হলো রমযান মাসে মানুষ ধর্ম-কর্ম ও নেক আমলের দিকে বেশি তৎপর হয় এবং অধিকাংশ মাত্রায় মানুষকে মসজিদমুখী হতে দেখা যায়।

রমযান মাস , লাইলাতুল কদরের মাস ।

এ মাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ' ।

'লাইলাতুল কদর' । রাতটি হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম । এ রাতে কুরআনুল কারিম অবতীর্ণ হয়েছে। রমযানের শেষ দশকের বেজোড় যে কোনো একটি রাতই 'লাইলাতুল কদর' । মহান আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ -إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ

অনুবাদ : সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ , নিশ্চয় আমি সেটাকে বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করেছি, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। (সূরা দুখান -২,৩)

এমন কি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই মর্মে বিশেষ ভাবে একটি সূরা অবতীর্ণ করে ইরশাদ করেন

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ -وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ -لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ -تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ -سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ

অনুবাদ : নিশ্চয় আমি সেটা ক্বদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি, এবং আপনি কি জানেন ক্বদর রাত্রি কি? ক্বদরের রাত হাজার মাস থেকে উত্তম। এতে ফরিশ্তাগণ ও জিবরাঈল অবতীর্ণ হয়ে থাকেন স্বীয় রবের আদেশে প্রত্যেক কাজের জন্য। এটা নিরাপত্তা, যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

(সূরা ক্বদর ,১-৫)

রমযান মাস, ক্ষমা পাওয়ার মাস

ক্ষমাপ্রাপ্তির মাস রমযান মাস , রমযান মাস পাওয়ার পরও যারা নিজেকে পাপ থেকে মুক্ত করতে পারল না, বিশ্ব নবী ﷺ তাদের ধিক্কার জানিয়েছেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ (৩ ধরনের ব্যক্তির ব্যাপারে) বলেছেন-

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ

অনুবাদ : ঐ ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক, যার কাছে আমার নাম নেওয়া হল অথচ আমার উপর দরুদ পাঠ করল না। ওই ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক, যার জীবনে রমযান মাস এল কিন্তু তার ক্ষমাপ্রাপ্ততার পূর্বেই অতিবাহিত হয়ে গেল। ওই ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক, যে তার পিতামাতাকে (বা তাদের একজনকে) বৃদ্ধাবস্থায় পেল কিন্তু তাদের খেদমত করার মাধ্যমে সে জান্নাতী হতে পারল না।

(তিরমিযী হাদীস নং - ৩৮৯০)

রোযাদারের বিশেষ সম্মানের মাস

রমযান মাসের রোযা পালনকারীদের জন্য রয়েছে বিশেষ সম্মান। জান্নাতের একটি দরজা শুধু রমযানের রোযা পালনকারীদের জন্যই নির্ধারিত। এ দরজা দিয়ে অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। হজরত খালেদ ইবনে মাখলাদ রাদিয়াল্লাহু আনহের সূত্রে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ

অনুবাদ:-জান্নাতে "রায়্যান" নামক একটি দরজা রয়েছে। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন রোযা পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাঁদের ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা করা হবে, রোযা পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তাঁরা ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাঁদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যাতে এ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না কওে।

(বুখারী শরীফ , হাদীস নং - ১৭৭৫)

সৎ কাজের প্রতিদান বেড়ে যাওয়ার মাস

রমযান মাসে ভালো কাজের প্রতিদান বহুগুণে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই মর্মে নবীয়ে করীম ? বলেছেন

যে ব্যক্তি রমযান মাসে কোনো একটি নফল ইবাদত করল, সে যেন অন্য মাসের একটি ফরজ আদায় করল। আর রমযানে যে ব্যক্তি একটি ফরজ আদায় করল, সে যেন অন্য মাসের ৭০টি ফরজ আদায় করল।

(ইবনে খুযাইমা)

এ ছাড়াও রমযান মাসের বহু ফজিলত ও মর্যাদা রয়েছে। যা সংক্ষেপে পর্যলোচনা করা অসম্ভব্

আল্লাহ তা'আলা যেন প্রত্যেক মু'মিন মুসলমানকে রমযান মাস যথাযথভাবে পালন করার তাওফিক প্রদান করেন। রমযানের রহমত ,বরকত , মাগফেরাত ও নাজাত লাভের তাওফিক প্রদান করেন, আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের চতুর্থ খলিফা। নবি দুলালী হজরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্বামী। হজরত হাসান ও হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর পিতা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকে ইলমের দরজা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

তার ৯টি বাণী তুলে ধরা হলো-

১. বুদ্ধিমানেরা কোনো কিছু প্রথমে অন্তর দিয়ে অনুভব করে, তারপর সে সম্বন্ধে মন্তব্য করে। আর নির্বোধেরা প্রথমেই মন্তব্য করে বসে এবং পরে চিন্তা করে।

২. বর্তমানের চলমান সময়কে ধ্বংস করে ভবিষ্যতের চিন্তা করে, আর বর্তমান অতীত হয়ে ভবিষ্যতে পৌঁছলে আবার অতীতের কথা স্মরণ করে আফসোস করে আর অশ্রু বিসর্জন দেয়।

৩. ঐ মানুষ বড়ই মুর্খ ও আশ্চর্যজনক যে, দুনিয়ার সম্পদ অর্জন করতে গিয়ে (আল্লাহর দেয়া) সুস্বাস্থ্য হারায়। তারপর আবার সুস্বাস্থ্যবান হতে অর্জিত সম্পদ নষ্ট করে।

৪. তোমার যা ভাললাগে তাই জগৎকে দান কর, বিনিময়ে তুমিও অনেক ভালো জিনিস লাভ করবে

৫. সে এমনভাবে জীবন অতিবাহিত করে যে, সে কখনো মৃত্যু বরণ করবে না। কিন্তু সে এমনভাবে মৃত্যু বরণ করে যে, সে কখনো জন্মই নেয় নি।

৬. স্বাস্থ্যের চাইতে বড় সম্পদ এবং অল্পে তুষ্টির চাইতে বগ সুখ আর কিছু নেই

৭. মানুষের সাথে তাদের বুদ্ধি পরিমাণ কথা বলো

৮. অভ্যাসকে জয় করাই পরম বিজয়

৯. সব দুঃখের মূল এই দুনিয়ার প্রতি অত্যাধিক আকর্ষণ

রোজা সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল

মাওলানা হাশিমুদ্দিন মিসবাহী, মুর্শিদাবাদ

মাসআলা:- রাত্রে রোজার নিয়ত করলো, নিয়তহীন থাকা অবস্থায় সকাল হল, তার নিয়তহীনতা কয়েকদিন ছিল তাহলে কেবল প্রথম দিনের রোজা হবে। অবশিষ্ট দিন সমূহের রোজা ক্বাযা করতে হবে যদিও পূর্ণ রমজান নিয়তহীন অবস্থায় ছিল এবং নিয়ত করার সময় পায়নি।

(দুররে মুখতার, বাহারে শরীয়ত)

মাসআলা:- সিঙ্গা লাগালে বা তেল অথবা সুরমা লাগালে রোজা ভঙ্গ হবে না। যদিও বা তেল বা সুরমার স্বাদ কণ্ঠনালীতে অনুভূত হয়। বরং থুথুর মধ্যে সুরমার রং দৃশ্যমান হলেও রোজা ভঙ্গ হবে না।

(বাহারে শরীয়ত)

মাসআলা:-চুম্বন করল, কিন্তু বীর্যপাত হয়নি তো রোজা ভঙ্গ হবে না। অনুরূপ স্ত্রীর প্রতি বরং তার লজ্জা স্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করল, হাত দ্বারা স্পর্শ করেনি বীর্যপাত হল, যদিও বারবার দৃষ্টিপাত করা বা সহবাস ইত্যাদির খেয়াল করার দরুন বীর্যপাত হয়েছে, যদিও দীর্ঘক্ষণ এ ধরনের খেয়াল করায় এরূপ হয়েছে, এমতাবস্থায় রোজা ভঙ্গ হবে না।

(দুররে মুখতার, বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ কথা বলতে থুথু এসে ঠোঁট ভিজে গেছে এবং তা পান করে নিয়েছে, অথবা মুখ থেকে লালা টপকে পড়েছে, কিন্তু একেবারে পড়ে যায়নি, তা তুলে পান করে ফেলা হল বা নাকে শ্লেষা আসলো, বরং নাকের বাইরে এসে গেল, কিন্তু বন্ধ হচ্ছে না তা অতিক্রম করে বেরিয়ে আসলো, বা কাশির আওয়াজে কাঁখারী মুখে আসলো এবং রেখে দিল, যতটুকই হোক না কেন, রোজা ভঙ্গ হবে না। তবে এসব ব্যাপারে সতর্কতা অপরিহার্য।

(আলমগীরি, দুররুল মোখতার, রাদ্দুল মোহতার, বাহারে শরীয়ত)

মাসআলাঃ মাছি কণ্ঠনালীর ভিতরে চলে গেছে, রোজা ভঙ্গ হবে না। ইচ্ছাকৃত হলে রোজা ভঙ্গ হবে।

(আলমগীরি)

ভুলবশতঃ সহবাস করতেছিল, স্মরণ হওয়া মাত্রই পৃথক হয়ে গেল বা সুবহে সাদিকের পূর্বে সহবাসে লিপ্ত ছিল, সুবহে সাদেক হওয়া মাত্রই পৃথক হয়ে গেল, রোজা ভঙ্গ হবে না। যদি উভয় অবস্থায় পৃথক হওয়াটা স্মরণ হওয়া এবং সুবহে সাদেক হওয়া মাত্রই হয়েছে, পৃথক হওয়ায় নড়াচড়ায় সহবাস হয়নি, যদি স্মরণ হওয়া অথবা সুবহে সাদিক হওয়া মাত্রই পৃথক হয়নি, কেবল স্থির হয়ে আছে, নড়াচড়া করেনি, রোজা ভঙ্গ হবে।

(দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ দু'দ্বার ভিন্ন অন্য পথে সহবাস করেছে, যতক্ষণ বীর্যপাত হয়নি রোজা ভঙ্গ হবে না, অনুরূপ হস্তমৈথুন দ্বারা বীর্য বের করলে, যদিও এটা কঠোর হারাম। হাদীস শরীফে হস্তমৈথুনকারীকে অভিশপ্ত বলা হয়েছে।

(দুররুল মোখতার)

মাসআলা: হায়েজ ও নিফাস সম্পন্না মহিলা সুবহে সাদিকের পর পবিত্র হলো, যদি দ্বিপ্রহরের পূর্বে অন্য রোজার নিয়ত করলো, তাহলে সেদিনকার রোজা হবেনা; ফরজ ও হবেনা নফলও হবেনা। রুগ্ন ব্যক্তি বা মুসাফির নিয়ত করলো বা পাগল ছিলো সুস্থ হওয়ার পর নিয়ত করলো ওদের সকলের রোজা হবে,

(দুররুল মোখতার)

মাসাআলা: নাবালেগ দিনে বালেগ হলো, বা কাফির দিনে মুসলমান হলো, আর ওটা সময় এমন ছিলো, যে সময়ে রোজার নিয়ত করা যায় এবং নিয়তও করে নিল অতঃপর রোজা ভঙ্গ করে দিল, তাইলে ওই দিনের কাযা ওয়াজিব নহে। (দুররুল মোখতার)

মাসআলা: মৃত ব্যক্তির রোজা কাযা রয়েছে, ওর ওলিকে ওর পক্ষ থেকে ফিদয়া আদায় করতে হবে, যদি মৃত ব্যক্তি এ ব্যপারে অসীয়ত করে যায় এবং মাল সম্পদও রেখে যায়। অন্যথায় ওলির উপর ফিদয়া দেয়া জরুরী নহে, তবে করলে তা হবে উত্তম।

মাসআলাঃ যদি গর্ভবতী বা দুগ্ধদানকারী মহিলার নিজের বা শিশুর প্রাণের বাস্তব আশংকা হয় তাহলে সেসময় রোজা না রাখার অনুমতি রয়েছে। সেই দুগ্ধদানকারিনী মহিলা শিশুর মা হোক বা ধাত্রী হোক। যদিও বা রমজান মাসে দুধ পান করানোর চাকুরী নিয়ে থাকে।

(দুররুল মোখতার, রাদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ এমন কোন জিনিষ ক্রয় করলো যার স্বাদ দেখা প্রয়োজন, স্বাদ না দেখলে ক্ষতি হতে পারে। তাহলে স্বাদ দেখতে ক্ষতি নেই অন্যথায় মাকরূহ।

(দুররুল মোখতার)

মাসআলাঃ বিনা কারণে স্বাদ নেওয়া যে মাকরূহ বলা হয়েছে; এটা ফরজ রোজার হুকুম। নফল রোজার ক্ষেত্রে মাকরূহ হবে না, যদি ওর প্রয়োজন হয়।

(রাদ্দুল মোহতার)

মাসআলাঃ মহিলাকে চুম্বন করা, গলা জড়িয়ে ধরা, শরীর স্পর্শ করা মাকরূহ, যদি বীর্যপাত হওয়ার আশংকা থাকে বা সহবাসে লিপ্ত হওয়ার ভয় হয় ঠোঁট এবং মুখে চুষণ করাটা মাকরূহ।

(রাদ্দুল মোহতার)

সাদকাতুল ফিতর মাসআলা:

ঈদের দিন ফজরের পর ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে সদকাতুল ফিতর আদায় করা মুস্তাহাব।
(ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১৮০)মাসআলা:

রমজান মাসের মধ্যে এবং রমজান মাসের পূর্বেও ফিতরা আদায় করা জায়েয।
(ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১৭৯)

হায় আফসোস! ঈদের দিনেও "সিনেমা!"

ঈদ মানে খুশি। এই দিনটি আল্লাহ পাক মুসলমানদের নেক ও সালেহ্ কর্ম করার জন্য প্রদান করেছেন। এই দিন হল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার দিন। কিন্ত আফসোসের বিষয় হল যে, এই বিশেষ দিনেও কিছু লোক হারাম কাজ করতে দ্বিধাবোধ করে না। তারা এই পবিত্র দিনেও নিজের বন্ধু-বান্ধব, বউ ও শালীদের নিয়ে সিনেমা দেখতে যায়। যে দিনে আল্লাহর দরবারে ক্রন্দন করে নিজের গুনাহের জন্য ক্ষমা চাওয়ার কথা ছিল। উল্টো সেই দিনে হারাম কাজ করে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে ফেলছে এরা। তাই সাবধান! সিনেমা দেখা অনান্য দিনেও হারাম। কিন্ত পবিত্র ঈদের দিনে আরও কঠিন হারাম। সুতরাং কবরকে স্মরণ করুন আর এই হারাম কর্ম থেকে দূরে থাকুন।

THE MONTHLY AL-MISBAH
April 2024
BY: WB MISBAHI NETWORK

প্রশ্ন করুন

কোন শরয়ী মাসআলা জিজ্ঞাসা করার জন্য

যোগাযোগ করুন

95546 21297/6296822303/ 96093 01137

আপনিও লিখুন

আল্-মিসবাহ মাসিক পত্রিকায় লেখা সাদরে গ্রহণ করা হবে। তবে কপি-পেস্ট বা অন্যের লেখা চুরি করে না পাঠানোর জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিঃ দ্রঃ কোন লেখা গ্রহণ করা কিংবা বাদ দেয়ার সম্পূর্ণ ইখতিয়ার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করবে।

লেখা পাঠানোর জন্য যোগাযোগ করুন

78658 64344 /95546 21297/6296822303

মতামত জানান

আল্-মিসবাহ মাসিক পত্রিকা আপনার মূল্যবান মতামতের অপেক্ষায় রয়েছে। আপনার প্রিয় পত্রিকা সম্পর্কে আপনি মতামত জানাতে পারেন।

6296822303/ 95546 21297

বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন

6296822303/ 95546 21297

Designed by: Roushan Ali-9733301647